সুখেঅসুখে
স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রকাশনা
৬ষ্ঠ বর্ষ নভেম্বর ২০১৫ সংখ্যা ২৪

রক্তরোগ

নিরোগ রক্তে সুন্দর জীবন

রক্তরোগের রকমফের
ডেঙ্গু আতঙ্ক নয়
হিমোফিলিয়া হলে
থ্যালাসেমিয়ার কথা
অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া
স্বেচ্ছায় রক্ত দিন জীবন বাঁচান

[HOTLINE : 10606]

Special tests for Hematology Department

Every minute, a number of diagnostic tests are being introduced worldwide. Being one of top most diagnostic service providers in Bangladesh, Labaid has created a track for availing these inevitable tests by outsourcing.

Especially, to facilitate blood disorder patients service, Labaid introduced a few number of key hematological tests, which are able to deliver valuable clues to save patients lives...

Blood disorder tests are:

LAP871	(H130) von WILLEBRAND FACTOR ANTIGEN; vWF Ag
LAP392	(E005) Immunofixation Electrophoresis (IFE), Serum
LAP203	(R061) Beta - 2 - Microglobulin, Serum
LAP493	(N039) JAK 2 Mutation Detection, Qualitative, PCR
LAP919	(XX025) Fanconi'S Anemia, Stress Cytogenetics
LAP973	(H228) Zap - 70 (Marker For CLL)
LAP974	(N052) Flt3 Gene Mutation

Importance of these tests:

- To help diagnose the cause of Hemostatic disorders.
- The assay is useful for diagnosis and monitoring patients with Monoclonal Gammopathies
- To help diagnosis of Multiple Myeloma prognosis
- To detect blood disorder known as a myeloproliferative neoplasm (MPN)
- To help differentiate between chromosome instability and idiopathic aplastic anemia

Why Labaid:

- Proper storage ability & maintain transport environment
- Competitive price offer
- Report in time
- Legally accepted

• *For Details: 017 6666 0704*

LAB AID LTD

LABAID LIMITED (DIAGNOSTIC)

House 1, Road 4, Dhanmondi, Dhaka 1205, Bangladesh
Fax : 88-02-9615497, Tel : 58610793-8, 9670210-3

সূচিপত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ নভেম্বর, ২০১৫ সংখ্যা ২৪

বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন ৫

ডেঙ্গু আতঙ্ক নয় ৯

হিমোফিলিয়া হলে ১২

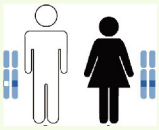
থ্যালাসেমিয়ার কথা ১৪

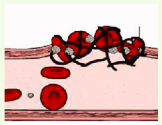
রক্তক্ষরণজনিত রোগ থেকে রক্ষায় ১৬

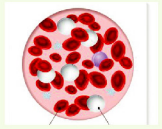
অ্যানিমিয়ার অল্পকথা ১৮

স্বেচ্ছায় রক্ত দিন জীবন বাঁচান ২০

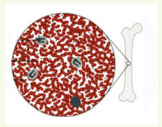
লিউকেমিয়া রক্তের ক্যান্সার ২২

অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া ২৫

বিয়ের আগে কেন রক্ত পরীক্ষা! ২৭

সুস্থ থাকুন সহজে ২৯

সুখে অসুখে

সুখে অসুখে

সম্পাদকীয়

শরীরে থাকে নানা ধরনের রক্তকণিকা। যেমন- লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা ও অনুচক্রিকা। লোহিত রক্তকণিকা ফুসফুস থেকে অক্সিজেন বহন করে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। শ্বেত রক্তকণিকা দেহে রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। অনুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধার জন্য জরুরি। এছাড়া রক্তের জলীয় অংশে থাকে নানা ধরনের প্রোটিন ও কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর। এই উপাদানগুলো শরীরকে সবল ও সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। এ সব উপাদানে যখন ব্যাপক তারতম্য দেখা দেয় তখন শরীরে অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া, হিমোফিলিয়া, ব্লিডিং ডিসঅর্ডার কিংবা ক্যান্সারসহ বিভিন্ন ধারণের রক্ত রোগ দেখা দিতে পারে। তবে শঙ্কার কিছু নেই, রোগ হলে তার প্রতিকারও আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ প্রযুক্তি আর দক্ষ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে এই এই রোগ-শোকের বিরুদ্ধে আমাদের লড়ার শক্তি তৈরি হয়েছে, এখন আমরা বিনা যুদ্ধে নাহি দেই সূচাগ্র মেদিনী।

এবারের পুরো সংখ্যাটি রক্তরোগ ও তার প্রতিকার নিয়ে সাজানো হয়েছে। আশা করি এ সংখ্যাটিও আপনাদের ভালো লাগবে।
শরীরের যেকোনো অস্বাভাবিকতায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
সুখে-অসুখে ল্যাবএইড সব সময় আপনার সঙ্গে আছে।

সম্পাদক
ডা. এ এম শামীম

বাড়ি ১, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫ ফোন : 58610793-8, *ফ্যাক্স :* 88-02-9615497
ই-মেইল : info@labaidgroup.com, *ওয়েব* : www.labaidgroup.com

রক্তরোগের রকমফের ও বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন

অধ্যাপক (ডা.) এম. এ. খান

এমবিবিএস, এফসিপিএস (হেমাটোলজি), এফআরসিপি (ইউকে)
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
হেমাটোলজি ও হেমাটোঅনকোলজি,
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
চেম্বার : ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল।

রক্ত কী ও রক্তের কাজ কী

রক্ত শরীরের এক ধরনের বিশেষ (টিস্যু) জলীয় অংশ। এর মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের রক্তকণিকা, যেমন- লোহিত রক্তকণিকা (RBC), শ্বেত রক্তকণিকা (WBC) ও অনুচক্রিকা (প্ল্যাটলেট) এ সবই বোনম্যারো থেকে উৎপন্ন হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে শরীরের বিভিন্ন স্থানে পরিপক্কতা লাভ করে। রক্তের রং লাল হওয়ার কারণ– লোহিত কণিকার মধ্যেমে হিমোগ্লোবিনের রং লাল।
রক্তকণিকার রয়েছে বিশেষ বিশেষ ধরনের কাজ, যেমন–

লোহিত রক্তকণিকা (RBC): ফুসফুস থেকে অক্সিজেন বহন করে শরীরের সর্বত্র সরবরাহ করা এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ফুসফুস দিয়ে নির্গত করা। শরীরের কোন স্থানে কয়েক মিনিটের জন্য রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হলে অক্সিজেনের অভাবে ওই স্থানে ইনর্ফাকসন হয়, যেমন– স্ট্রোক, গেংগ্রিন।

শ্বেত রক্ত কণিকা (WBC): শ্বেতরক্ত কণিকাগুলো দেহে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এটি অনেকটা পুলিশের মতো কাজ করে। শ্বেতকণিকা শরীরের সেলুলার ও হিউমোরাল ইমিউনিটি গড়ে তোলে, যা শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি।

অনুচক্রিকা (প্ল্যাটলেট): অতিক্ষুদ্র অথচ অতিপ্রয়োজনীয় রক্ত কণিকা– যা রক্ত জমাট বাঁধার জন্য জরুরি। সাধারণ রক্তে এর পরিমাণ– দেড় লাখ থেকে সাড়ে চার লাখ। রক্তে যদি কোন কারণে এর পরিমাণ ৩০ হাজারের কম হয় তবে রক্তক্ষরণের আশঙ্কা থাকে।

এছাড়া রক্তের জলীয় অংশে রয়েছে নানা ধরনের প্রোটিন ও কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর (যা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে)।

রক্তরোগের লক্ষণ কী কী

রক্ত উপাদানগুলোর বিশেষ বিশেষ কাজ রয়েছে। যদি এগুলো সঠিক মাত্রায় উৎপন্ন না হয় তাহলে রক্তশূন্যতা, রক্তক্ষরণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়ে ইনফেকশন হয়ে থাকে।

- রক্তশূন্যতাজনিত লক্ষণ– অবসাদ ও দুর্বলতা, বুক ধড়ফড় করা, কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি
- শরীরে ইনফেকশনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়– ফলে লাগাতার জ্বর থাকে
- রক্তক্ষরণজনিত সমস্যা– ত্বক, নাক, দাঁতের মাড়ি, চোখে রক্তক্ষরণ, মাসিকের সময় বেশি বেশি রক্ত যাওয়া ইত্যাদি
- শরীর বা হাড়ে ব্যথা, জয়েন্টে ব্যথা
- লিভার ও স্প্লিন বেড়ে যাওয়া
- গলা, বগল ও অন্যত্র লিমফনোড (লসিকা গ্রন্থি) বড় হওয়া
- কোন কোন সময় কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা ও পর্যায়ক্রমে শরীরের নিম্নাঙ্গ প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে
- জয়েন্ট ফুলে যাওয়া, ব্যথা হওয়া, ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ না হওয়া ইত্যাদি

তবে মনে রাখতে হবে যে, এসব লক্ষণ একসঙ্গে দেখা দেয় না। এসব লক্ষণ অন্যান্য রোগেও দেখা দিতে পারে।

বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন কী

বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন এক ধরনের আধুনিকচিকিৎসা ব্যবস্থা। শরীরের অন্য অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশনের মতো বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন বা অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে সার্জারি বা অপারেশনের প্রয়োজন হয় না।

রোগীর অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত অস্থিমজ্জা (বোনম্যারো) ক্যামোথেরাপির মাধ্যমে নষ্ট করে (Conditioning) ডোনার থেকে বিশেষ ধরনের রক্তকোষ বা স্টেমসেল (সিডি-৩৪+) সংগ্রহ করে (Harvesting) রোগীর শরীরে প্রবেশ করানো হয় (অনেকটা ব্লাড ট্রান্সফিউশনের মতো)। ২-৩সপ্তাহের মধ্যে স্টেমসেল থেকে নতুন রক্তকণিকা তৈরি হতে শুরু করে। আর রোগী ধীরে ধীরে সুস্থ হতে থাকে। যদিও এ অবস্থার প্রথম ৩ মাস রোগীর জন্য খুব ঝুঁকিপূর্ণ। এ সময় নানা ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ১৯৬৮ সালে প্রথম সাফল্যের সঙ্গে ইমিউনোডেফিসিয়ান্সি ডিজ্রোম এর জন্য এবং ১৯৭২ সালে এপ্লাস্টিক এনিমিয়ার জন্য বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করা হয়। Donell Thomas ১৯৭০ সালে এর জন্য নোবেল পুরস্কার পান।

বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন মূলত দুই ধরনের

এলোজেনিক বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন: অন্যের শরীর থেকে (HLA matching donar) স্টেমসেল সংগ্রহ করে রোগীর শরীরে প্রতিস্থাপন করাকে এলোজেনিক বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন বলে।

অটোলগাস বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন: রোগীর নিজের শরীরের বোনম্যারো সংগ্রহ করে পুনরায় তার শরীরে প্রতিস্থাপন করাকে অটোলগাস বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন বলে।

স্টেমসেল কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়

স্টেমসেল সংগ্রহ করাকে Harvesting বলে। নিম্নলিখিত স্থান থেকে স্টেমসেল সংগ্রহ করা হয়।

Bone Marrow: ডোনারকে অজ্ঞান করে তার পেলভিক বোন (কোমরের হাড়) থেকে প্রায় ৫০০ এমএল রক্ত সংগ্রহ করতে হয়

Peripheral Blood: রক্ত থেকে এফেরেসিস এর মাধ্যমে স্টেমসেল সংগ্রহ করা হয়। এর জন্য ডোনারকে inj G-CSF দেয়ার প্রয়োজন হয়

Umbilical cord blood: নবজাতকের নাড়ি কাটার পর অবশিষ্ট নাড়ি ও প্লাসেন্টা থেকে ৭০-১০০এমএল রক্ত সংগ্রহ করে Cord Blood Banking এ রাখা হয় ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য

রক্তরোগসমূহ কী কী

এক কথায় বলতে গেলে রক্তের উপাদান থেকে সৃষ্ট রোগসমূহই রক্তরোগ। প্রধান দশটি রক্তরোগ হলো–

নানা ধরনের রক্তশূন্যতা	: (আয়রন ও ভিটামিনের অভাবজনিত কারণে)
থ্যালাসেমিয়া ও হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া	: (লোহিত রক্তকণিকা স্বাভাবিক সময়ের আগেই ভেঙে যায়)
এপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া	: (রক্ত উৎপাদন হয় না)
ব্লাড ক্যান্সার	: (ALL, AML, CML, CLL) (একিউট ও ক্রনিক লিউকেমিয়া)
মাল্টিপল মাইলোমা	: (প্লাজমা সেলের ক্যান্সার)
লিমফোমা	: (HL, NHL) (লসিকা গ্রন্থি/লিমফোসাইটের ক্যান্সার)
ব্লিডিং ডিজঅর্ডার	: (যেমন–হিমোফিলিয়া, আইটিপি, ডিআইসি) (রক্ত জমাট না বাঁধার কারণে রক্তক্ষরণ)
মাইলোডিসপ্লাসটিক সিনড্রোম	: (অস্বাভাবিক রক্তকণিকা তৈরি ও ভেঙে যাওয়া)
মাইলো ফাইব্রোসিস	: (বোনম্যারোতে ফাইব্রাস টিস্যু বেড়ে যাওয়া)
পলিসাইথেমিয়া	: (রক্তের লোহিতকণিকা ও হিমোগ্লোবিনের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি)

বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন চালু করতে কী কী প্রয়োজন

- নির্দিষ্ট পরিমাপের Biological Clean Room
- প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, উন্নতমানের ল্যাবরেটরি (Haematology Microbiology, Immunology, Biochemistry) ও আধুনিক ব্লাড ট্রান্সফিউশন বিভাগ
- দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেকনিশিয়ান, নার্স ও ডাক্তার (জুনিয়র ও সিনিয়র হেমাটোলজিস্ট)
- সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োজন হতে পারে (অর্থাৎ মেডিসিনের সকল বিভাগ বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন)
- বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন পরিবর্তন Patient Support & Monitoring এর প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকতে হবে।

ডোনার সিলেকশন কীভাবে করা হয়

ডোনার সিলেকশন বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর জন্য প্রয়োজন ভাই-বোনদের HLA typing (A, B, C, DR, DQ) করে যার সঙ্গে ১০০% মিলবে তাকে ডোনার হিসেবে গ্রহণ করা। অনেকের ধারণা, ব্লাড গ্রুপ এক হলেই চলবে, আসলে তা ঠিক নয়। ট্রান্সপ্লান্টেশনের পর রোগীর ব্লাড গ্রুপ পরিবর্তন হয়ে ডোনারের ব্লাড গ্রুপ হয়ে যায়। ডোনার ও রোগীর HLA typing যত বেশি অমিল হবে, তত বেশি আশঙ্কা থাকে graft rejection, graft versus host disease এবং মৃত্যুর। এ থেকেই বুঝা যায়, ১০০ ভাগ ম্যাচ ডোনার সিলেকশন কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। মাত্র ২৫-৩০%ক্ষেত্রে HLA Match ভাই-বোন ডোনার পাওয়া যায়। ফলে Unrelated Donor এর ওপর অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করতে হয়।

বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কী ধরনের

ক্ষেত্রবিশেষে বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন ৬০-৭০ ভাগ কার্যকর। এ ক্ষেত্রে জটিলতাও আছে, যেমন–

- ইমিউন রিয়েকশন, যেমন– GVHD, বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন এর ১০০ দিনের মধ্যে যে GVHD হয় তাকে একিউট এবং পরবর্তী সময় যে GVHD হয় তাকে Chronic GVHD বলে
- গ্রাফট ফেইলিউর বা রিজেকশন ১০-৩০% হতে পারে
- ইনফেকশন একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ব্যাকটেরিয়াল, ফাংগাল, ভাইরাস ও নিউমোসিসটিক কারিনি ইনফেকশন বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন পরবর্তী জীবননাশের কারণ হতে পারে
- এছাড়া Infertility, Second Malignancy, Endocrine Problem, Cataract হতে পারে।
- এলোজেনিক ট্রান্সপ্লান্টেশনে ১০-১৫% রোগীর মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে।

ফিউচার ডেভেলপমেন্ট কেমন হবে

- বোনম্যারো ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে ডোনার ছাড়াই রোগীর কোষ থেকে বোনম্যারো উৎপাদন করে বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করা সম্ভব হতে পারে। এর ফলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও গ্রাফট রিজেকশন থাকবে না।
- Umbilical Cord Blood Transplantation – শিশু জন্মের পর প্লাসেন্টা সংগ্রহের পর সেখান থেকে স্টেমসেল আলাদা করে Cry-Preservation – সম্ভব এবং প্রয়োজনমতো ট্রান্সপ্লান্টেশন করা যেতে পারে। এটি শিশুদের বেলায় অধিক কার্যকর হলেও বড়দের ক্ষেত্রে স্টেমসেলের পরিমাণ কম থাকায় কম কার্যকর। কোড ব্লাড স্টেমসেল ইমিউনোলজিক্যালি অপরিপক্ক বলে GVHD এবং Rejection এর আশংকা কম।

বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশনের প্রয়োজনীয়তা কী

আমরা জানি, শরীরের রক্তকণিকাগুলোর বিশেষ কাজ রয়েছে। এই রক্ত কণিকাগুলো প্রাথমিকভাবে বোনম্যারোতে উৎপন্ন হয়ে থাকে। যদি এসব কণিকা সঠিক মাত্রায় উৎপন্ন না হয়, তাহলে রক্তশূন্যতা, রক্তক্ষরণ ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়ে ইনফেকশন হবে। এর ফলে রোগীর মৃত্যু অবধারিত হয়ে পড়ে। আমরা জানি, ব্লাড ক্যান্সারসহ কিছু ক্যান্সার কেমোথেরাপি দিয়ে চিকিৎসা করা হলেও পূর্ণ নিরাময় হবার সম্ভাবনা খুবই কম। এসব ক্ষেত্রে বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন একমাত্র সম্ভাবনাময় চিকিৎসা। উদাহরণ হিসেবে কিছু রোগের নাম উল্লেখ করা হলো, যেখানে বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করা প্রয়োজন হয়।

ব্লাড ক্যান্সার, মাইলোমা, এপ্লাস্টিক এনিমিয়া, লিম্ফোমা (Repalsed), কিছু বংশগত রোগ যেমন- থ্যালাসেমিয়া মেজর, Storage Disease, Immunodeficiency।

বাংলাদেশে বোনম্যারে ট্রান্সপ্লান্টেশন কার্যক্রম ১৪ মার্চ ২০১৪ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রথম শুরু হয় এবং সাফল্য জনকভাবে এ পর্যন্ত মোট ১৬ জন রোগীর অটোলোগাস বোনম্যারে ট্রান্সপ্লান্টেশন করা হয়েছে। এই ১৬ রোগীর মধ্যে ১১টি মাল্টিপল মায়োলমা, ৩টি লিম্ফোমা রোগী, ১টি একিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া ও ১টি প্লাজমা সেল লিউকেমিয়া ছিল। এখানে ট্রান্সপ্লান্টেশন রিলেটেড মৃত্যু শূন্যভাগ অর্থাৎ শতভাগ সফলতা। আগামী ২০১৬ সালেই থ্যালাসেমিয়া, অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া, অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া, অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া রোগীর এলোজেনিক ট্রান্সপ্লান্টেশন শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে।

হাড়ের সুরক্ষায় বনএইড

অস্টিওপোরোসিস একটি রোগ যা হাড়কে দুর্বল করে ফেলে। অস্টিওপোরোসিস পুরুষ এবং নারী উভয়ের ক্ষেত্রে হতে পারে তবে মেনোপজ (৪০-৪৫ বছরের বেশি বয়স্ক নারীদের মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়া) পরবর্তী নারীদের বেশি হয়ে থাকে। অস্টিওপোরোসিসের প্রথমদিকে উপসর্গগুলো দেখা দেয় না, তা সত্ত্বেও অস্টিওপোরোসিসের রোগীদের উচ্চতা কিছুটা কমে যেতে পারে এবং তাদের হাড় বিশেষ করে মেরুদণ্ড, হাতের কব্জি, হিপ বোন ভেঙে যেতে পারে। অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধযোগ্য এবং সঠিক ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করা যায়। বনএইড (ইবানড্রোনিক এসিড) নারী এবং পুরুষদের অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধে ও চিকিৎসায় নির্দেশিত। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে অস্টিওপোরোসিস রোগ প্রতিরোধে প্রতিমাসে একটি বনএইড ১৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট খেতে পারেন।

Bonaid 150
Ibandronic Acid 150 mg

বনএইড খাওয়ার দিন নির্ধারণ

- বনএইড ট্যাবলেট মাসে একটি করে খেতে হয়।
- বনএইড খাওয়ার জন্য এমন একটি দিন বেছে নিন যা আপনার জন্য মনে রাখা সুবিধাজনক (যেমন মাসের প্রথম দিন)।
- প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

Go smooth
... without a Fracture

Bonaid 150
Ibandronic Acid 150 mg

Recovers BMD with quality API

- European API to restore BMD
- Two times more potent than Risedronate
- Once monthly convenient dose
- Ensures early recovery from Osteoporosis

Labaid Pharma Quality First...

ডেঙ্গু আতঙ্ক নয়...

ডাঃ সমীরণ কুমার সাহা
এমবিবিএস, পিএইচডি (মেডিসিন)
এফএসিপি (ইউএসএ), এফআরসিপি (এডিন)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
সিনিয়র কনসালটেন্ট, মেডিসিন বিভাগ
চেম্বার: ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল, ঢাকা।

'ডাক্তার সাহেব, এনা দ্যাকেনতো হামার কী হছে? ৭/৮ দিন ধর‍্যা হামার গাওত জ্বর, গাওত, হাতত, পাওত ব্যামনা। চোখ ভাটার লাকান লাল হচ্ছে। খালি উকি উঠিচ্ছে। খাবার উচি নাই, কত অসুদ খালাম, কিচ্চু হয় না। তয় হামার কি ডেঙ্গু হছে?' ইদানীং প্রধানত এসব প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি আমরা। আজ থেকে দুই শতাব্দীরও বেশি পূর্বে (১৭৮০) প্রথম ডেঙ্গুজ্বরের বর্ণনা পাওয়া যায়। ১৯০৫ সালেই বিশ্ববাসী জানতে পারে, এটি মশা দ্বারা ছড়ায়– তার মাত্র একবছর পরই জানা যায়, এটি ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত একটি রোগ। তবে প্রকৃত ভাইরাসটি আবিস্কৃত হয় ১৯৪৪ সালে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এটি একটি ব্যাপক-বিস্তৃত রোগ। সমস্ত পৃথিবীতে বৎসরে প্রায় এক কোটি লোক এ রোগে আক্রান্ত হয়। আমাদের বাড়ির আঙিনা এবং আশপাশে বসবাসকারী মশা অ্যাডিস ইজিপশিয়াই রোগটি ছড়ায়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শরীরই মূলত রোগের আধার। রোগের বাহক এবং রোগ দুটিই উষ্ণ এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আমেরিকা এবং আফ্রিকার শৃঙ্গে, উত্তর অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ ইউরোপ বিশেষত অড্রিয়াটিক উপকূলীয় অঞ্চলে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

আপনি কি আক্রান্ত হচ্ছেন? লক্ষণগুলো মিলিয়ে নিন

হঠাৎ জ্বর হওয়া, মাথাব্যথা, চোখের পেছনে, কোমরে, অস্থিসন্ধি বা হাড়ে ব্যথা। তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠতে পারে। জ্বর শুরুর প্রথম ১/২ দিন গায়ে ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে। দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ দিনে রোগী ক্ষুধামান্দ্য, বমি-বমি ভাব, গলাব্যথা, সর্দি-কাশি, জিহ্বার স্বাদহীনতার অভিযোগ করতে পারে। ৩৬ দিনের মাথায় জ্বর সেরে যায় এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে (যেমন-হাত,পা, মুখ ইত্যাদি) ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে, যেগুলো সাধারণত ১-৫ দিন স্থায়ী হয়। ফুসকুড়ি ওঠার পর জ্বর আবার দেখা দিতে পারে এবং সাথে লসিকাগ্রন্থি ফুলে যেতে পারে। কখনও কখনও নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে। ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় রক্তে শ্বেতকণিকার স্বল্পতা দেখা যেতে পারে।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis)

এ রোগের সাথে ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, রুবেলা ইত্যাদি রোগের লক্ষণগুলো মিলে যায়। সুনির্দিষ্টভাবে রোগটিকে বোঝার উপায় রক্তে IgM-enzyme immuno assay করা অথবা রক্তে ভাইরাস জেনোমা খুঁজে বের করা।

চিকিৎসা (Treatment)

তেমন কোনো সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী অসুখ নিবারণ করতে হবে। শুধু অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ দেয়া নিষিদ্ধ। কারণ এতে রোগীর শরীরে রক্তপাতের সম্ভাবনা বেশি থাকে। ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার (Dengue Haemorrhagic Fever) হচ্ছে ডেঙ্গুজ্বরের মারাত্মক রূপ এবং এতে রক্তক্ষরণের ফলে মারাত্মক শক হতে পারে (Dengue Shock Syndrome); এটিও অ্যাডিস ইজিপাশিয়াই মশা দ্বারা বাহিত। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহ থেকে রক্ত গ্রহণ করার পর ভাইরাস মশকের স্যালিভারি গ্রন্থিতে বহুগুণ বর্ধিত হয়। ৮-১০ দিন সুপ্তিকালের পর এটি অন্যের শরীরে সংক্রমণ ঘটাতে পারে।

কী কী উপসর্গ দিয়ে চেনা যায়?

সাধারণত হঠাৎ করে খুব বেশি জ্বর দিয়ে রোগের শুরু; সঙ্গে মাথাব্যথা, ক্ষুধামান্দ্য, পেটব্যথা। আসলে প্রথম কদিন লক্ষণগুলো ক্লসিক্যাল ডেঙ্গুর মতোই। শরীরের চামড়ার নিচে রক্তপাতের লক্ষণ দেখা যায়, মুখমণ্ডল, হাত, পা, নাক, দাঁতের মাড়িতে এবং আন্ত্রিক রক্তপাতও হতে পারে, তবে খুব কম।
সাধারণত ২-৭ দিন পর সংকটাপন্ন অবস্থা দেখা দেয়। এ সময় জ্বর কমে যায়। আক্রান্ত ব্যক্তি ঘামতে থাকে এবং ছটফট করে। হাত-পাঠান্ডা হয়ে যায় এবং রোগী শকে চলে যায়। চামড়া ঠান্ডা হয় এবং পালস প্রেশার ২০ মি. মি. এর নিচে থাকে। এ অবস্থায় রোগী ২০-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মারা যেতে পারে। মাঝে মাঝে ইলেক্ট্রোলাইটের অসমতা, মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ এবং যকৃতের (Liver) ফেইলিওর হতে পারে। রোগটি সাধারণত ৭-১০ দিন স্থায়ী হয়। রক্তে শ্বেতকণিকার স্বল্পতা দেখা দিতে পারে। তবে তুলনামূলকভাবে রক্তে লিম্ফোসাইটের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রদত্ত কিছু নিয়ামক (Who Indicators)

- ২-৭ দিন স্থায়ী উচ্চমাত্রার জ্বর
- রক্তপাত (Haemorrhage), বৃহৎ যকৃৎ (Hepatomegaly)
- রক্তে অনুচক্রিকার সংখ্যা (<100000/cumm (thrombocytopaenia);
- শক (Shock)

ডেঙ্গুজ্বর নিয়ন্ত্রণ (Control)

ডেঙ্গুজ্বর নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মশক নিয়ন্ত্রণ। বদ্ধ জলাশয়, ফুলের টবের পানি, টায়ার, টিনের পাত্রস্থিত পানি অপসারণ করা প্রয়োজন। মাঝে মাঝেই লার্ভা ধ্বংসকারী স্প্রে ব্যবহার করতে হবে।

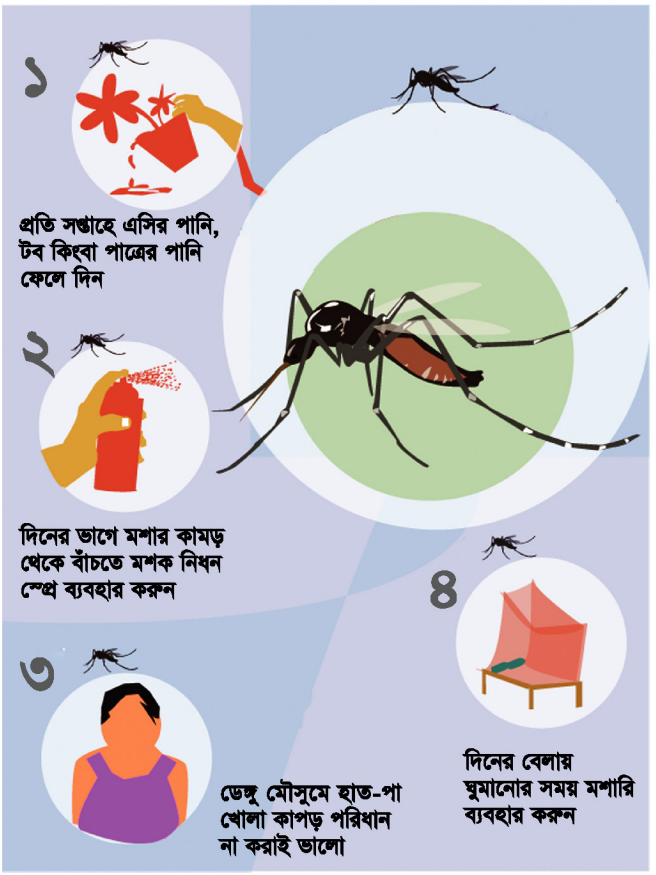

চারটি মারাত্মক অবস্থা (Four Critical State)

- গ্রেড-i :জটিলতাহীন
- গ্রেড-ii :জটিলতাহীন
- গ্রেড-iii :শক ও গ্রেড-iv: মারাত্মক শক।

কিভাবে রোগনির্ণয় করা যায় (Diagnosis)

- ভাইরাস শনাক্তকরণ
- অ্যান্টিবডি শনাক্তকরণ
- ভাইরাস জেনোম শনাক্তকরণ

চিকিৎসা (Treatment)

প্রথম ২৪-৪৮ ঘণ্টা স্যালাইন, প্লাজমা ইত্যাদি দ্বারা রোগীর শরীরের পানির স্বল্পতা দূর করতে হবে। অ্যাসিডোসিস এবং হাইপোন্যাট্রিমিয়া ঠিক করতে হবে। অতিরিক্ত স্যালাইন রোগীর সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে; কার্ডিয়াক ফেইলিওর অথবা ফুসফুসে পানি জমতে পারে।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (Prevention)

বাড়ির আনাচে-কানাচে, ছাদে কিংবা রাস্তাঘাটে পরিষ্কার পানি ৫/৬ দিনের বেশি জমতে না দেয়া। ঘরের মধ্যে জমে থাকা প্রয়োজনীয় পরিষ্কার পানির আধারগুলোতে কেরোসিন কিংবা একটু লবণ দিয়ে দেয়া। অ্যাকুরিয়ামে ফিল্টার ব্যবহার করা। সন্দেহজনক রোগীকে আলাদা করে মশারির নিচে রাখা যাতে রোগীকে কোনো মশা কামড়াতে না পারে। সন্দেহজনক রোগী সম্পর্কে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে জানানো। ভোরে এবং সন্ধ্যায় মশানিধন ওষুধ ছিটানো এবং রাতে মশারি টাঙিয়ে ঘুমানো।

রোগ নির্ণয়ের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে

ল্যাবএইড এখন দয়াগঞ্জে

ডায়াগনস্টিক সেবাসমূহ:

- প্যাথলজি
- ডিজিটাল এক্স-রে
- সিটি-স্ক্যান
- এমআরআই
- 4D আলট্রাসনোগ্রাম
- ইসিজি
- ইকো-কার্ডিওগ্রাম
- কালার ডপলার
- ইটিটি
- ওপিজি
- ভিডিও এন্ডোসকপি
- ভিডিও কলোনসকপি
- ভিডিও ব্রনক্সকপি
- ভিডিও Laryngoscopy
- Pap's Smear
- সকল প্রকার হরমোন টেস্ট
- Torch প্যানেল
- হিস্টো ও সাইটোপ্যাথলজি
- বায়োকেমিস্ট্রি
- ইমিউনোলজি
- সেরোলজি
- হেমাটোলজি

কনসালটেশন সেবাসমূহ:

- মেডিসিন
- হৃদরোগ
- ফিজিক্যাল মেডিসিন
- গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি
- অ্যাজমা
- নিউরো মেডিসিন
- নিউরো সার্জারি
- নাক, কান ও গলা রোগ
- নবজাতক ও শিশু রোগ
- বাত, ব্যথা ও প্যারালাইসিস
- ডায়াবেটিস ও হরমোন রোগ
- গাইনি এন্ড অবস্
- লিভার রোগ
- কিডনি রোগ
- অর্থোপেডিক
- মেডিসিন ও বক্ষব্যাধি
- চর্ম ও যৌন রোগ
- চক্ষু রোগ
- ক্যান্সার
- ইউরোলজি
- জেনারেল সার্জারি
- স্পাইন সার্জারি

ডায়াগনস্টিক > কনসালটেশন > মেডিকেল চেক-আপ > কর্পোরেট মেডিকেল চেক-আপ > ডায়াবেটিক চেক-আপ
ফার্মেসি > অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস > ল্যাবএইড হাসপাতাল তথ্য কেন্দ্র

LAB AID LTD

ল্যাবএইড লিমিটেড (ডায়াগনস্টিক), দয়াগঞ্জ

৩০-৩১/১, দয়াগঞ্জ হাট লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা ১১০০, ফোন : ৯৫৭৪৯৮২, ৭১১৫০৬৫
ই-মেইল : info@labaidgroup.com, ওয়েব : www.labaidgroup.com

হিমোফিলিয়া হলে...

ডাঃ উৎপল কুমার চন্দ

এমবিবিএস, এফসিপিএস (মেডিসিন)
রিউমাটোলজিতে (বাত রোগ) উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
স্পেশাল ইন্টারেস্ট ইন হরমোন ডিজিজেস (থাইরয়েড ও ডায়াবেটিস)
মেডিসিন, হৃদরোগ ও বাতরোগ বিশেষজ্ঞ
কনসালটেন্ট ও বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ, জেনারেল হাসপাতাল, খুলনা।
চেম্বার : ল্যাবএইড লিঃ (ডায়াগনস্টিক), খুলনা।

শরীরের কোথাও কেটে গেলে বা অন্য কোন কারণে শরীরের ভিতরে বা বাইরে রক্তক্ষরণ হলে, তা স্বাভাবিকভাবেই এক সময় বন্ধ হয়ে যায়। এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিমোফিলিয়া একটি জন্মগত রক্তরোগ যেখানে রক্ত স্বাভাবিকভাবে জমাট বাঁধতে পারে না। রক্ত জমাট বাঁধার জন্য যে উপকরণ (Clotting factors) থাকে, হিমোফিলিয়া রোগীর দেহে সেটি কম থাকে।

আন্তর্জাতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় হিমোফিলিয়া প্রতি ১০ হাজারে একজনের মধ্যে দেখা দেয়। তবে বাংলাদেশে কত জন হিমোফিলিয়া রোগী রয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই।

হিমোফিলিয়ার প্রকারভেদ

শরীরে Clotting factors- এর অভাবের উপর ভিত্তি করে হিমোফিলিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়:

১) হিমোফিলিয়া এ ঃ Clotting factors VIII এর অভাবে হয়।

২) হিমোফিলিয়া বি ঃ Clotting factors IX এর অভাবে হয়।

হিমোফিলিয়া বাবা-মায়ের জিন থেকে সন্তানের শরীরে প্রবেশ করে। পুরুষদের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং মহিলারা বংশানুক্রমে এই রোগের জিন বহন করে থাকে।

যদি বাবা হিমোফিলিয়ার রোগী হন এবং মায়ের মধ্যে হিমোফিলিয়ার জিন না থাকে, তাহলে সন্তানদের সবাই সুস্থ হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং মেয়ে সন্তানরা রোগের জিন বহন করে। যদি কোন মেয়ের দেহে জিন থাকে এবং তার স্বামী সুস্থ থাকেন তাহলে ছেলে সন্তানদের ৫০% হিমোফিলিয়া রোগ নিয়ে এবং মেয়ে সন্তানদের ৫০% বহনকারী হিসেবে জন্ম নেয়।
যদি বাবা হিমোফিলিয়া রোগী ও মা বহকারী হন, তবে মেয়ে সন্তানদের মধ্যেও হিমোফিলিয়া দেখা দিতে পারে।

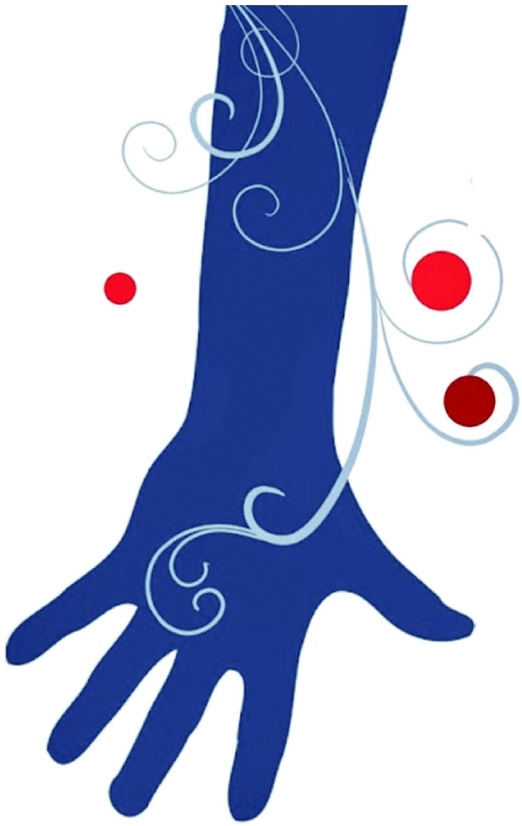

হিমোফিলিয়ার প্রকাশ

সাধারণত Clotting Factor-এর পরিমানের ওপর এই রোগের প্রকার নির্ভর করে। Factor যত কম হবে, রোগ তত বেশি প্রকট হবে।

অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণই এ রোগের প্রকাশ জানান দেয়। যেটি চামড়ার নিচে ছোট রক্তক্ষরণ থেকে শুরু করে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যেমন: অস্থিসন্ধি, মস্তিস্ক, পেটের গহ্বর কিংবা কেটে গেলে বা সার্জারির সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ইত্যাদি হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

লক্ষণ ও নিম্নলিখিত অল্প কিছু পরীক্ষার মাধ্যমেই হিমোফিলিয়া নির্ণয় করা সম্ভব -

1. CT (Clotting Time), 2. BT (Bleeding Time), 3. PT (Prothrombin Time), 4. APTT, 5. Factor VIII & IX Assay

এছাড়া অন্যান্য পরীক্ষারও প্রয়োজন হতে পারে।

চিকিৎসা

এটি একটি জন্মগত রোগ, তাই বিশ্বে এখন পর্যন্ত হিমোফিলিয়া সম্পূর্ণভাবে নিরাময়ের কোন চিকিৎসা আবিস্কৃত হয়নি। তবে অত্যাধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। এ রোগের মূল লক্ষণই হলো রক্তক্ষরণ। তাই রক্তক্ষরণ যাতে না হয় কিংবা রক্তক্ষরণ হলেই দ্রুত যাতে বন্ধ করা যায় সে দিকেই বেশি নজর দিতে হবে।

১) যে সব কাজকর্মে আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে তা থেকে দূরে থাকতে হবে।

২) রক্তক্ষরণ শুরু হলে বিশ্রামে থাকা, রক্তক্ষরণের স্থলে বরফ দিয়ে চেপে রাখতে হবে।

৩) অস্থিসন্ধিস্থলে রক্তক্ষরণ হলে সেই জায়গাটির নড়াচড়া বন্ধ করতে হবে অথবা ক্রেপ ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪) যে সব ওষুধ রক্তক্ষরণ বৃদ্ধি করতে পারে যেমন - Aspirin, NSAID, Clopidogrol ইত্যাদি ওষুধ সেবন করা যাবে না।

৫) সর্বোপরি দ্রুত নিকটস্থ রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

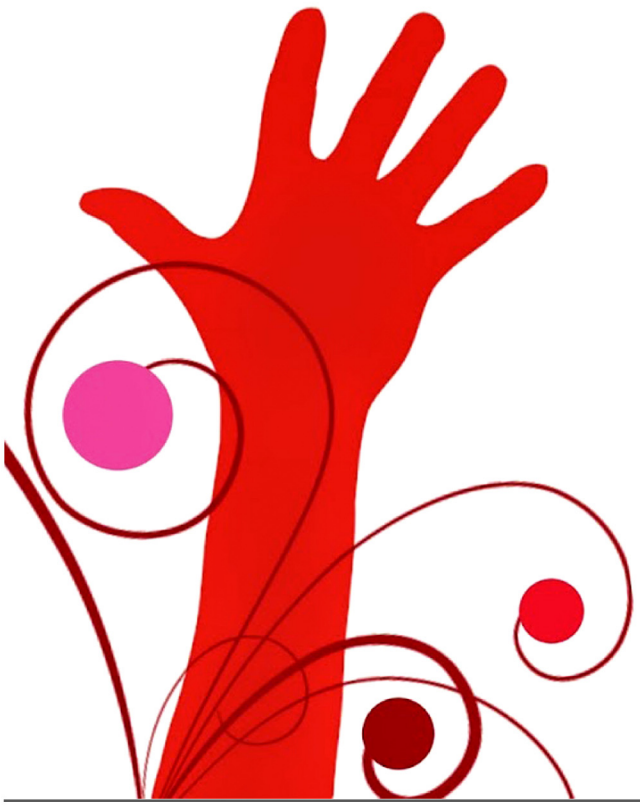

হিমোফিলিয়া রোগীদের, হিমোফিলিয়া সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকা দরকার। যদি কোন রোগী এ রোগ ও তার চিকিৎসা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানেন, তাহলে তার চিকিৎসা করা সহজ হয়ে যায়। রোগী শহর অথবা গ্রামে, উন্নত চিকিৎসা প্রাপ্তির কাছে অথবা দূরে থাকতে পারে। সে জন্য চিকিৎসা উপকরণ; যেমন- ট্রানেক্সামিক এসিড ক্যাপসুল/ইনজেকসন; Fresh Whole Blood (Donor), Fresh Frozen Plasma এমনকি Factor VII এবং IX সংরক্ষনের জন্য রোগীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে হবে।

হিমোফিলিয়া একটি নিয়ন্ত্রণ যোগ্যরোগ। এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে রোগীকে সুস্থ রাখা সম্ভব।

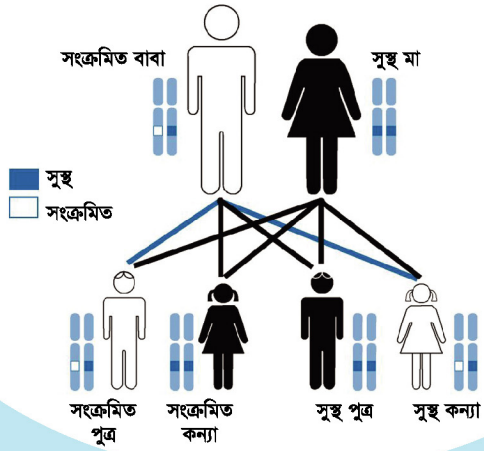

থ্যালাসেমিয়ার কথা

ডাঃ জামাল উদ্দিন আহমেদ
এমবিবিএস (ডিএমসি)-গোল্ড মেডালিস্ট
এফসিপিএস (মেডিসিন), সিসিডি (ডায়াবেটোলজি)
সহকারী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ
বারডেম (ডায়াবেটিক) হাসপাতাল ও ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
মেডিসিন ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ
চেম্বার: ল্যাবএইড লিঃ (ডায়াগনস্টিক), উত্তরা।

থ্যালাসেমিয়া একটি রক্তরোগ। সাধারণত পিতা-মাতা থেকে রোগী এ রোগ প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষেত্রে শরীরে অস্বাভাবিক গঠনের হিমোগ্লোবিন তৈরি হয়। হিমোগ্লোবিন রক্তের লোহিত কণিকায় থেকে শরীরে অক্সিজেন বহন করে। থ্যালাসেমিয়ার ফলে রক্তে লোহিত কণিকা ভেঙে যায়, যার ফলে রোগীর প্রকট রক্তশূন্যতা বা অ্যানেমিয়া দেখা দেয়। হিমোগ্লোবিন দুটি প্রোটিন নিয়ে গঠিত। ১. আলফা গ্লোবিন ও ২. বিটা গ্লোবিন। আলফা গ্লোবিন ও বিটা গ্লোবিন উৎপাদনের নিয়ন্ত্রক জিনে যদি কোন সমস্যা থাকে তখন এই সব প্রোটিনের উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং রোগী থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হয়।

থ্যালাসেমিয়ার ধরন

দুই ধরনের থ্যালাসেমিয়া আছে

আলফা থ্যালাসেমিয়া - যখন আলফা গ্লোবিন প্রোটিন অনুপস্থিত বা মিউটেড হয়।

বিটা থ্যালাসেমিয়া - যখন বিটা গ্লোবিন প্রোটিন অনুপস্থিত বা মিউটেড হয়।

থ্যালাসেমিয়া আরো কয়েক রকমের হয়ে থাকে, প্রত্যেকটি আবার উপভাগে বিভক্ত।

আলফা থ্যালাসেমিয়া ও বিটা থ্যালাসেমিয়া প্রধান দুটি ভাগ হলো–

ক) থ্যালাসেমিয়া মেজর : পিতা-মাতা উভয়ের থেকে প্রাপ্ত অস্বাভাবিক জিন থেকে সৃষ্ট থ্যালাসেমিয়া হল থ্যালাসেমিয়া মেজর।

খ) থ্যালাসেমিয়া মাইনর : শুধু মাতা বা পিতা থেকে প্রাপ্ত অস্বাভাবিক জিন থেকে সৃষ্ট থ্যালাসেমিয়া। এই ক্ষেত্রে সাধারণত কোন উপসর্গ থাকে না।

বিটা থ্যালাসেমিয়া মেজরকে কুলি-অ্যানিমিয়া বলা হয়।

লক্ষণসমূহ

আলফা থ্যালাসেমিয়ার মেজরে আক্রান্ত শিশু জন্মের সময়, পূর্বে বা গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে মারা যেতে পারে।

থ্যালাসেমিয়া মেজর আক্রান্ত রোগী স্বাভাবিকভাবে জন্ম নিলেও এক বছরের মধ্যেই মারাত্মক রক্তস্বল্পতা দেখা দেবে।

অন্য লক্ষণগুলোর মধ্যে–

১. মুখমণ্ডলের হাড়ের অস্বাভাবিক গঠন,
২. দুর্বলতা, ৩. দৈহিক বৃদ্ধি স্থবিরতা,
৪. দ্রুত শ্বাষ-প্রশ্বাস ও ৫. জন্ডিস

মাইনর আলফা, বিটা থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্তের লোহিত রক্তকণিকাগুলো আকারে ছোট হয়, তবে কোন লক্ষণ থাকে না ।

পরীক্ষা নিরীক্ষা

চিকিৎসক প্রথমে শারিরিকভাবে পরীক্ষা করেন। পরবর্তীতে ল্যাবে রক্তের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করা হয়-

- মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে লোহিত রক্তকণিকা ছোট হয়ে গেছে কি না, তা দেখা হয়।
- CBC পরীক্ষার মাধ্যমে রক্তস্বল্পতা (অ্যানিমিয়া) হয়েছে কি না দেখা হয়।
- হিমোগ্লোবিনের অস্বাভাবিকতা দেখার জন্য হিমোগ্লোবিন ইলেক ট্রোপোরোসিস পরীক্ষা করা হয়।
- আলফা থ্যালাসেমিয়া নির্ণয়ের জন্য মিউটেশনাল অ্যানালাইসিস পরীক্ষা করা হয়।

চিকিৎসা

থ্যালাসেমিয়া মেজরের চিকিৎসার জন্য নিয়মিত রক্ত ট্রান্সফিউশন করতে হয় অথবা ফিলেট সাপ্লিমেন্ট দিতে হয় এবং কিছু রোগীর ক্ষেত্রে বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের প্রয়োজন পড়ে।

[HOTLINE : 10606]

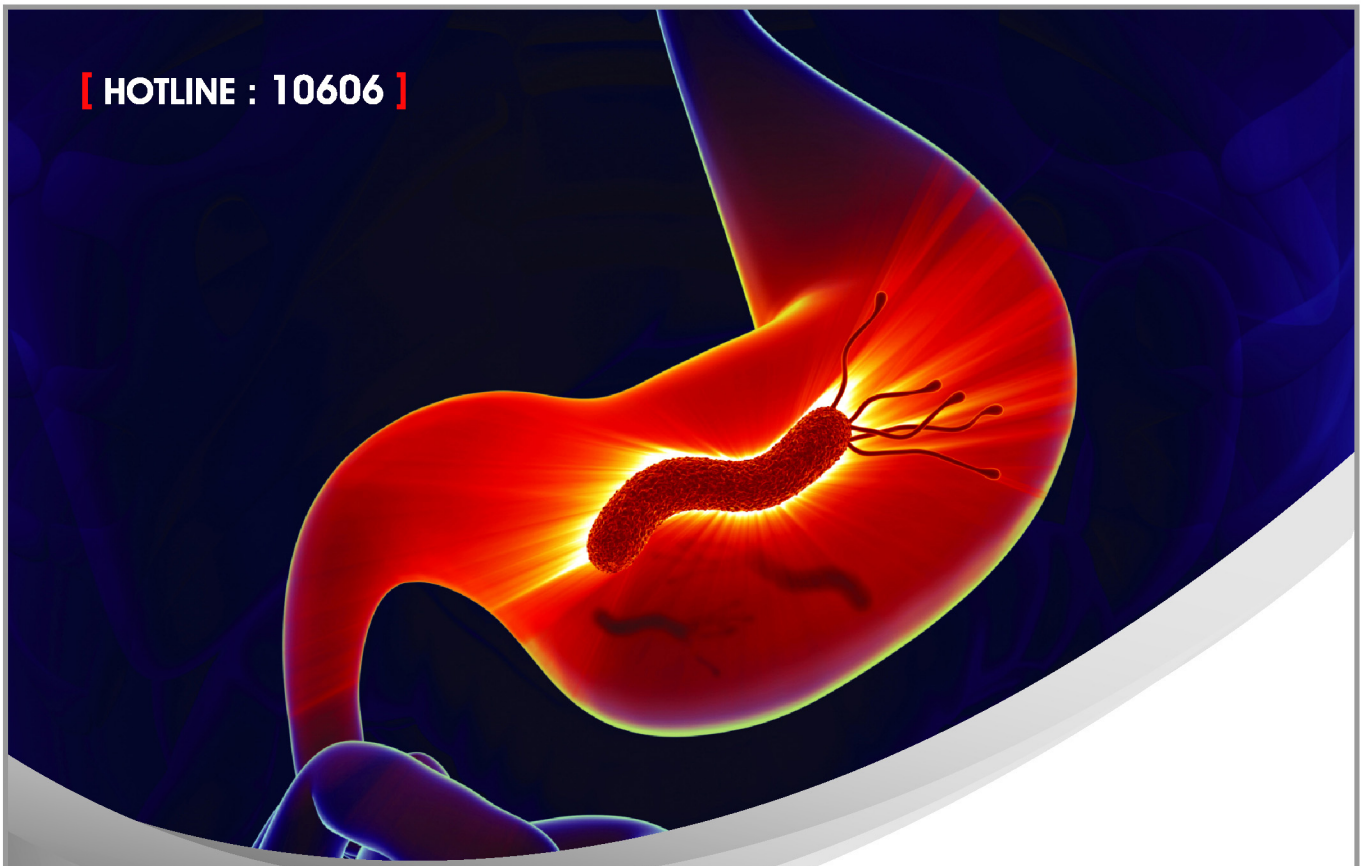

গ্যাস্ট্রাইটিস, গ্যাস্ট্রিক আলসার,
পেপটিক আলসার রোগ নির্ণয়ের সর্বাধুনিক পরীক্ষা

ইউরিয়া ব্রেথ টেস্ট

গ্যাস্ট্রাইটিস, গ্যাস্ট্রিক আলসার, পেপটিক আলসারের মত রোগগুলোর জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়ার নাম *Helicobacter Pylori (H. pylori)* এই ব্যাকটেরিয়াটির উপস্থিতি এবং এর সংক্রমন চিহ্নিত করতে ইউরিয়া ব্রেথ টেস্ট সবচেয়ে দ্রুততর ও কার্যকর পদ্ধতি। যেখানে কোন ইনজেকশন বা রক্তের প্রয়োজন হয় না। টেস্টটির মাধ্যমে *Helicobacter Pylori*-এর উপস্থিতি নির্ণয় হলে, চিকিৎসা প্রদানের পদ্ধতিটি অত্যন্ত নির্ভুল এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সেবনের মাধ্যমে রোগটি নির্মূল সহজতর হয়।

পরীক্ষাটির প্রস্তুতি:

- এই পরীক্ষাটি করতে হয় খালি পেটে, অথবা খাবার গ্রহনের নূন্যতম দুই ঘন্টা পরে।
- দুটি ব্যাগ দরকার হয়, একটি স্বাভাবিক অবস্থায় প্রশ্বাস ধরে রাখে অন্যটি ক্যাপসুল গ্রহনের পরে।
- প্রথম ব্যাগটিতে অর্থাৎ বেস লাইন ব্রেথ ব্যাগের মুখ খুলে সেখানে সামর্থ অনুযায়ী সবটুকু শ্বাস ছেড়ে দিতে হবে। এবার ব্যাগের মুখটি বন্ধ করে দিতে হবে।
- ৮০ - ১০০ এমএল পানির সাথে ক্যাপসুলটা খেয়ে নিতে হবে। এবার খুব ধীরে সুস্থে অপেক্ষা করুন কমপক্ষে ৩০ মিনিট।
- এবার দ্বিতীয় ব্যাগটির মুখ খুলে, মাউথ পিস দিয়ে শ্বাস সংরক্ষন করে নিতে হবে ঠিক আগের পদ্ধতিতেই।
- সবশেষে এই দুই ব্যাগ নমুনা শ্বাস, ব্রেথ টেস্ট অ্যানালাইজার দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হবে।

• বিস্তারিত জানতে : ০১৭ ৬৬৬৬ ০৭৯০

LAB AID LTD

ল্যাবএইড লিমিটেড (ডায়াগনস্টিক)

বাড়ি ১, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা, ফোন : ৫৮৬১০৭৯৩-৮, ৯৬৭০২১০-৩
ওয়েব : www.labaidgroup.com, ই-মেইল : info@labaidgroup.com

রক্তক্ষরণজনিত রোগ থেকে রক্ষায়

ডাঃ মুঃ সাইদুল আলম রাজিব
এমবিবিএস, বিসিএস, এফসিপিএস (মেডিসিন)
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
সহকারী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ
ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত (বারডেম)
চেম্বার ঃ ল্যাবএইড লিঃ (ডায়াগনস্টিক), চট্টগ্রাম।

মানুষের দেহে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ না হওয়ার জন্য অনুচক্রিকা বা প্লেটলেট সক্রিয় থাকে। এছাড়া রক্ত জমাট বাঁধার জন্য যে ১৩টি ফ্যাক্টর আছে সেগুলোও রক্ত জমাট বাঁধার জন্য অত্যাবশ্যকীয় এবং সেই সঙ্গে রক্ত পরিবহনের জন্য দরকার সবল রক্তনালী। এদের যেকোনটির সমস্যার জন্য রক্তক্ষরণ রোগ হতে পারে।

ক. অনুচক্রিকার সমস্যাজনিত রোগ

থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া

রক্তে স্বাভাবিক প্লেটলেটের পরিমাণ ১,৫০,০০০-৩,০০,০০০প্রতি ঘন মিলিলিটারে। ১,৫০,০০০ এর চেয়ে সংখ্যা কমে গেলে তাকে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া বলে। এটি দুপ্রকারে বিভক্ত।

১. **প্রাইমারি থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া**
একে ইডিওপ্যাথিক থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া পারপুরাও বলে, যার নির্দিষ্ট কোন কারণ নেই। ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ভাইরাস জ্বর থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসা ছাড়াই ভালো হয়ে যায়। কখনো ভালো হতে ২ মাস সময় নেয়। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে সাধারণত জ্বর থাকে না এবং ভালো হতে ৬ মাসেরও বেশি সময় লাগতে পারে। রক্তের অনুচক্রিকার সংখ্যা ২০,০০০ এর নিচে নেমে গেলে শরীরের বিভিন্ন অংশে চামড়ার নিচে রক্তপাত হয় এবং জমাট বাঁধা রক্ত দেখা যায়। এ ছাড়া নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ, মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিক এর সময় বেশি রক্তপাত হওয়া বা অনেক দিন পর্যন্ত মাসিক বন্ধ না হওয়া এই রোগের উপসর্গ। ৫০০০ এর নিচে হলে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ যেমন লিভার, কিডনি অন্ত্র ও মস্তিষ্কে রক্তপাত হয়, এমনকি রোগীর মৃত্যুও ঘটে।

২. **সেকেন্ডারি থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া**
হেপারিন, কুইনাইন প্রভৃতি বিভিন্ন ওষুধ, লিভার সিরোসিস, হেপাটাইটিস-সি, এস.এল.ই, এন্টিসফফোলিপিড সিন্ড্রোম, বয়স্কদের ক্ষেত্রে রক্তের ক্যান্সার বা লিউকেমিয়া সেকেন্ডারি থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া এর জন্য দায়ী।

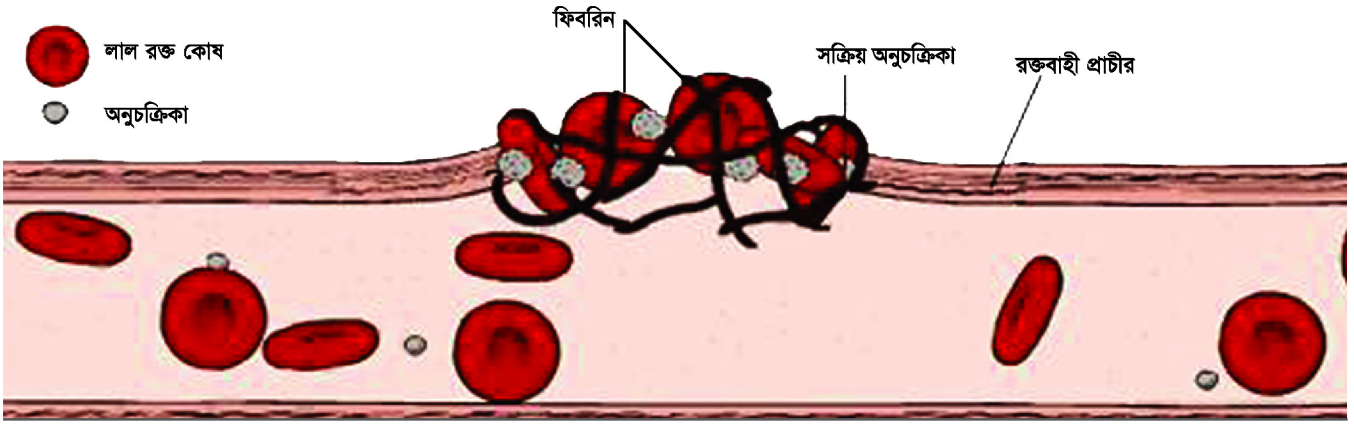

খ. রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যাজনিত কারণ

কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর এর অনুপস্থিতি এর জন্য রক্ত জমাট বাঁধাজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে।

১. বংশগত বা জিনগত কারণ জন্মের পরই ধরা পড়ে

কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর ৮-এর স্বল্পতা হলে হিমোফিলিয়া 'এ' এবং ফ্যাক্টর ৯-এর স্বল্পতা হলে তাকে হিমোফিলিয়া 'বি' বা 'ক্রিস্টমাস রোগ বলা হয়। তন্মধ্যে 'এ' সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। বাচ্চাদের খতনা করার সময় বা সাধারণ কাঁটাছেঁড়ার পর যদি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রক্তপাত হয়, তখন এই রোগ আছে বলে সন্দেহ করতে হবে। এছাড়া বাচ্চারা যখন হামাগুড়ি দিতে শেখে তখন যারা এই রোগে আক্রান্ত তাদের হাঁটু ফুলে যায় এবং ব্যথার তীব্রতায় বাচ্চারা কান্না করে। এছাড়া কনুই, জংঘা, পায়ের গোড়ালি, ইত্যাদি জায়গায়ও রক্তপাত হয়ে ফুলে যায়। বারবার হতে থাকলে এইসব অস্থিসন্ধি বা জয়েন্টের তরুনাস্থি ক্ষয় হয় এবং সেকেন্ডারি অস্টিওআথ্রাইটিস দেখা যায়।
এছাড়া এই ফ্যাক্টরগুলো খুবই কম মাত্রায় থাকলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয় এমনকি জন্মের সময় শিশুর মৃত্যুও ঘটাতে পারে। এছাড়া ভন উইলব্রান্ড ডিজিজ, হাইপো বা ডিসফ্রিব্রিনোজেনেসিয়া, কম্বাইন্ড ২, ৭, ৯, ১০ ফ্যাক্টর ডেফিসিয়েন্সি এগুলোও বংশগত কারণে হয়।

২. জন্মের পরবর্তীতে অর্জিত কারণ

এক্ষেত্রে রক্তে কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরগুলো পূর্বে স্বাভাবিকভাবে থাকলেও যকৃতের রোগ যেমন সিরোসিস এবং লিভার ফেইলিউর, ভিটামিন কে-এর অভাব এছাড়া ওষুধ যেমন হেপারিন, ওয়ার ফেরিন, ফন্ডাপেরিনাক্স ইত্যাদি কারণে যেকোন সময়ে রক্তে প্রয়োজনীয় ফ্যাক্টরগুলোর অভাব দেখা দেয় এবং রক্ত জমাট বাঁধতে বিঘ্ন ঘটায়।

গ. রক্তনালীর সমস্যাজনিত কারণ

১. হেরেডিটারি হেমোরেজিক টেলানজিয়েকট্যাসিস এটি জন্মগতভাবে বাবা বা মা যে কোন একজন থেকে প্রাপ্ত হয় এবং জন্মের কিছুদিন পরেই দেখা যায়।

২. ভিটামিন সি-এর অভাব বা স্কার্ভিরোগ বিভিন্ন ধরনের ভাস্কুলাইটিস, ইউরোমেয়িা, বিভিন্ন ক্ষতিকারক ওষুধ রক্তনালীর ক্ষতি করে এবং রক্তক্ষরণ ঘটায়।

রক্তকোষ সমূহ

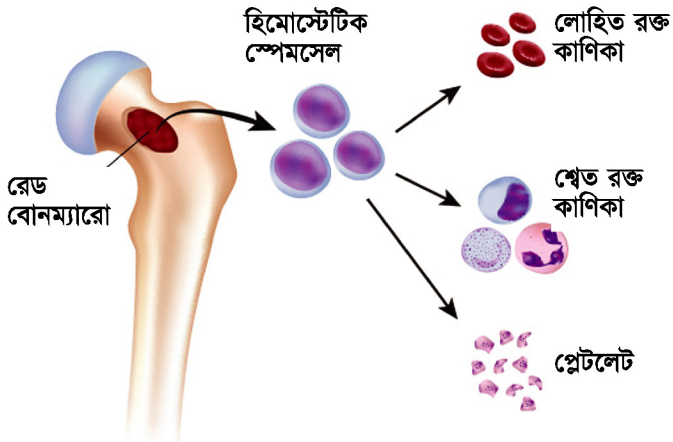

চিকিৎসা

রক্তের অণুচক্রিকা, ১৩টি কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর কিংবা রক্তনালীর অস্বাভাবিকতার কারণে সাধারণত রক্তপাতজনিত সমস্যাগুলো দেখা দেয়।
রক্তপাতজনিত সমস্যা এড়াতে সচেতনতা যেমন জরুরি ঠিক তেমনি কোন উপসর্গ দেখা দিলেই কালক্ষেপণ না করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।

অ্যানিমিয়ার অল্পকথা

অধ্যাপক ব্রিঃ জেনাঃ একে মোঃ মোস্তফা আবেদীন (অব.)
এমবিবিএস, এমসিপিএস, এফসিপিএস (হেমাটোলজি)
হেমাটো-অনকোলজিস্ট
কম্বাইন্ড মিলিটারি হাসপাতাল
সিনিয়র কনসালটেন্ট, ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি এন্ড হেমাটোলজি
চেম্বার ঃ ল্যাবএইড লিঃ (ডায়াগনস্টিক), ঢাকা।

শরীরে রক্ত কমে গেলে সাধারণত আমরা অ্যানিমিয়া বলি। অ্যানিমিয়া কোন রোগ নয়-উপসর্গমাত্র। আমরা রক্তের হিমোগ্লোবিন এর পরিমাণ নির্ণয় করে অ্যানিমিয়া আছে কিনা স্থির করি। রক্তের হিমোগ্লোবিন বয়স ও লিঙ্গ ভেদে স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে তাকে এনিমিয়া বা রক্তস্বল্পতা বলি।

একজন পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ স্বাভাবিক পুরুষের রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ থাকে ১৩.৫ গ্রাম থেকে ১৬.৫ গ্রাম/ডেসিলিটার এবং এক পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ মহিলার থাকে ১১.৫-১৪.৫গ্রাম/ডেসিলিটার। সুস্থ শিশুর জন্মের পর থেকে বিভিন্ন রয়সে রক্তে স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন বিভিন্ন পরিমানে থাকে। এই হিমোগ্লোবিন রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে থাকে। অ্যানিমিয়া বা রক্তস্বল্পতার মাত্রা ভেদে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে পারে যেমন: অবসাদ-দুর্বলতাও ক্লান্ত লাগা, শরীর ফ্যাকাশে হয়ে আসা, স্বল্প পরিশ্রমে শ্বাস কষ্ট ও বুক ধড়ফড় করা, মাথা ঝিমঝিম করা, চোখের সামনে বিভিন্ন রং এর কনা দেখা এবং ঝাপসা দেখা, মাথা ব্যথা করা, হাতে পায়ে ঝিনঝিন করা ও অবশভাব হওয়া, চামড়া, চুল ও নখে বিভিন্ন রকম পরিবর্তন।

এনিমিয়ার বিভিন্ন কারণে হতে পারে। নিচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো–

১. **হঠাৎ রক্তক্ষরণ**
   ক) সড়ক দুর্ঘটনা বা আঘাত
   খ) শৈল্য চিকিৎসার সময়।
   গ) পেপটিক আলসার
   ঘ) বৃহদান্তের হঠাৎ রক্তক্ষরণ

২. **অনেকদিন যাবৎ রক্তক্ষরণ**
   ক) জরায়ু থেকে রক্তক্ষরণ
   খ) পেসিটিক আলসার বা অর্শ্ব থেকে রক্ত ক্ষরণ

৩. **লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদন বিকলতা**
   ক) পুষ্টির অভাব যেমন– লৌহ, ফলিক এসিড, ভিটামিন বি-১২ ইত্যাদি।
   খ) লোহিত কণিকা তৈরিতে ব্যাঘাত– প্রদাহ ও ইনফেকশন, ছড়িয়ে যাওয়া ক্যান্সার, ইত্যাদি।
   গ) বৃক্কের বিকলতা
   ঘ) এ্যাপ্লাস্টিক এনিমিয়া/হাড়মজ্জা শুকিয়ে যাওয়া
   ঙ) বিভিন্ন রক্তের ক্যান্সার যেমন– লিউকেমিয়া, লিম্ফোমা
   চ) কিছু জন্মগত রোগ যেমন– থ্যালাসেমিয়া
   ছ) অতিরিক্ত লোহিত রক্ত কণিকা ভেঙে যাওয়া

রোগীর উপসর্গ দেখার পর আমরা ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা করে অ্যানিমিয়া এবং উহার ধরণ স্থির করতে পারি যেমন– CBC, Periferal Blood Film, Hb-Electrophoresis রক্তে লৌহের পরিমাণ (Serum Iron Profile) রক্তে ফলিক এসিড ও ভিটামিন বি-১২ এর পরিমাণ দেখে ইত্যাদি।

আমাদের দেশে এখনো লৌহের অভাব জনিত অ্যানিমিয়া সবচেয়ে বেশি। আর্থসামাজিক উন্নতির যুগেও আমাদের শিশুদের মধ্যে লৌহ অভাবজনিত রক্তস্বল্পতা অধিক। এর উল্লেখযোগ্য কারণ আমরা শিশুদেরকে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি দুধ ও অন্যান্য খাদ্য খাওয়াতে বেশি স্বাচ্ছন্দ অনুভব করি। এসব কৃত্রিম দুধ খাদ্যে লৌহের পরিমাণ অনেক কম থাকে। আগের দিনে এই রক্তসল্পতাকে বলা হতো অভাবের অ্যানিমিয়া। এখন একে বলা যায় স্বাচ্ছন্দের অ্যানিমিয়া। অ্যানিমিয়া নির্ণয় ও উহার ধরণ জানার পর লৌহ ও রক্তের লোহিত কণিকার গঠন ও বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পুষ্টি যেমন– আমিষ, ভিটামিন ইত্যাদি খাওয়ানো প্রয়োজন। চিকিৎসার পূর্বে অ্যানিমিয়ার কারণ খুঁজে বের করে ব্যবস্থা নিতে হবে।

বক্ষব্যাধি ও খাদ্যনালী বিশেষজ্ঞ সার্জন

ডাঃ কাজী সাইফুল ইসলাম (শাকিল)

এমবিবিএস, এমএস (থোরাসিক সার্জারি)
সহকারী অধ্যাপক, থোরাসিক সার্জারি
জাতীয় বক্ষব্যাধি ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা।
চেম্বার: ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল
সময় : বিকাল ৫টা-সন্ধ্যা ৭টা (শুক্রবার বন্ধ)

মেডিসিন, পরিপাকতন্ত্র ও লিভার ব্যাধি বিশেষজ্ঞ

ডাঃ আতিয়া সাঈদ

এমবিবিএস, এফসিপিএস (মেডিসিন) এমডি (গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি)
প্রাক্তন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
কনসালটেন্ট, ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল
চেম্বার: ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল
সময় : সকাল ৯টা-দুপুর ১টা (শুক্রবার বন্ধ)

প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ

ডাঃ তাছনীম আকতার

এমবিবিএস (সিএমসি), এফসিপিএস (গাইনি এন্ড অবস)
ল্যাপারোস্কপিক সার্জন
কনসালটেন্ট, ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল
চেম্বার: ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল
সময় : সকাল ৯টা-দুপুর ১টা এবং সন্ধ্যা ৬টা-রাত ৮:৩০ টা (শুক্রবার বন্ধ)

কিডনি, মেডিসিন ও ডায়াবেটিস রোগ বিশেষজ্ঞ

ডাঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

এমবিবিএস (ডিইউ), এমডি (নেফ্রোলজি)
সহযোগী অধ্যাপক, নেফ্রোলজি বিভাগ
কনসালটেন্ট, ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল
চেম্বার: ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল
সময় : সকাল ৯টা- রাত ৮টা (শুক্রবার বন্ধ)

বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি বিশেষজ্ঞ

ডাঃ মারুফ আলম চৌধুরী

এফসিপিএস (সার্জারি) এফসিপিএস (প্লাস্টিক এন্ড রিকন্সট্রাক্টিভ সার্জারি)
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (পঙ্গু হাসপাতাল)
চেম্বার: ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল
সময় : প্রতি রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা-সন্ধ্যা ৭টা

সিনিয়র কনসালটেন্ট

ডাঃ কৃষ্ণ মোহন সাহু

এমবিবিএস, এমডি (ইন্টারনাল মেডিসিন), ডিএনবি (নেফ্রোলজি)
ডিএম (নেফ্রোলজি), ফেলোশিপ (নেফ্রোলজি), কানাডা
কিডনি রোগ, কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ও মেডিসিন
চেম্বার : ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল, শনি ও রবি ৯টা-৫টা
চেম্বার : ল্যাবএইড (ডায়াগনস্টিক) লিঃ গুলশান, সোম, মঙ্গল বুধ ও বৃহঃ ৯টা-৫টা, শুক্রবার ৯টা-১২টা

স্বেচ্ছায় রক্ত দিন
জীবন বাঁচান

ডা. সৈয়দ মাহাবুব করিম শামীম
এমবিবিএস, ডিবিএস এন্ড টি (ডিইউ), ফেলোশিপ ইন ট্রান্সফিউশন মেডিসিন (বোস্টন ইউনিভার্সিটি)
কনসালটেন্ট ও বিভাগীয় প্রধান
ল্যাবএইড ব্লাড ব্যাংক

একজন মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচাতে রক্তের প্রয়োজন, রক্তের গ্রুপ এবি পজেটিভ-এ ধরনের আবেদন আমরা প্রায় প্রতিদিন দেখি টেলিভিশনে, খবরের কাগজে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। মনে রাখা জরুরি, আপনার দানকৃত এক ব্যাগ রক্ত (৪৫০ মিলি) ফিরিয়ে দিতে পারে মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর নতুন জীবন। আপনার দানকৃত এক ব্যাগ রক্তে তিনজন রোগী সরাসরি উপকৃত হতে পারে। রক্তের তিনটি প্রধান উপাদান, লোহিত কণিকা (RBC), অনুচক্রিকা (Platelet) এবং রক্তরস (Plasma) তিন ধরনের রোগীর প্রয়োজন হয়।

আপনার মনে হয়তো নানা প্রশ্ন উঁকি দিতে পারে যেমন– কেন রক্ত দেব, কী ক্ষতি– কি লাভ বা আমি কি রক্ত দান করতে পারব ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন দেখি কারা রক্ত দান করতে পারবে

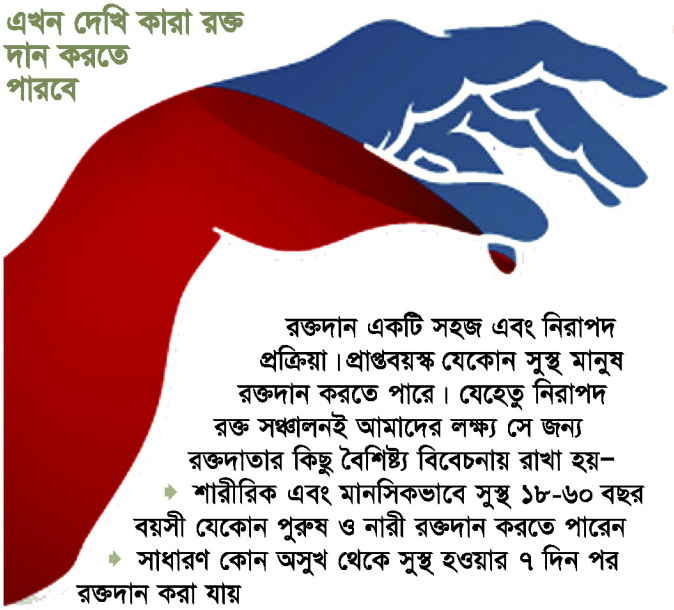

রক্তদান একটি সহজ এবং নিরাপদ প্রক্রিয়া। প্রাপ্তবয়স্ক যেকোন সুস্থ মানুষ রক্তদান করতে পারে। যেহেতু নিরাপদ রক্ত সঞ্চালনই আমাদের লক্ষ্য সে জন্য রক্তদাতার কিছু বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রাখা হয়–

- শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ ১৮-৬০ বছর বয়সী যেকোন পুরুষ ও নারী রক্তদান করতে পারেন
- সাধারণ কোন অসুখ থেকে সুস্থ হওয়ার ৭ দিন পর রক্তদান করা যায়
- রক্তদাতার ওজন ৫০ কেজি বা তার বেশি হতে হয়
- যেকোন সুস্থ ব্যক্তি প্রতি তিন মাস পর একবার এবং বছরে চারবার রক্ত দান করতে পারেন।

রক্তদাতা নির্বাচন

রক্ত সংগ্রহের পূর্বে রক্তদাতার উপযুক্ততা দেখা অত্যন্ত জরুরি, সে ক্ষেত্রে রক্তদাতার যদি কোন রোগ হয়ে থাকে তার সঠিক ইতহাস, মেডিক্যাল পরীক্ষা যেমন– উচ্চতা, ওজন, রক্তচাপ, নাড়ির গতি, রক্তের গ্রুপ সাথে তার রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ইত্যাদি।

রক্ত দানে সাধারণত কত সময় প্রয়োজন

রক্তদানের পুরো প্রক্রিয়া শেষ করতে সাধারণত ১ ঘণ্টা সময় লাগে। রক্তদান প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের সংক্রমক রোগে আক্রান্ত হবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

রক্তদান কি নিরাপদ?

হ্যাঁ, রক্তদান একটি সহজ ও সম্পূর্ণ নিরাপদ প্রক্রিয়া। জীবাণুমুক্ত সুচ, রক্তের ব্যাগ একজন রক্তদাতার জন্য একবারই ব্যবহার করা হয়। রক্তদান প্রক্রিয়ায় কোন ধারনের সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

রক্তদাতার সাধারণত কী কী পরীক্ষা করা হয়

সাধারণত রক্তের গ্রুপ নির্ধারণ, রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে যে যে রোগ সংক্রামিত হতে পারে যেমন– এইডস, হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, সিফিলিস, গনরিয়া এবং ম্যালেরিয়া পরীক্ষা করা হয়। সর্বোপরি রক্তদাতার রক্ত এবং রোগীর রক্তের গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষা (Compatibility test) করা হয়।

কী পরিমাণ রক্ত আপনি দান করবেন

একবার একজন রক্তদাতা এক ব্যাগ (৪৫০ মিলি) রক্ত দিয়ে থাকেন, যা কিনা আধা লিটারের কম। সাধারণত একজন ৭০ কেজি ওজনের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে আনুমানিক ৫ লিটার রক্ত থাকে, সুতরাং আপনার দানকৃত ৪৫০ মিলি রক্ত খুব তাড়াতাড়ি আবার পূর্ণ হয়ে যায়। রক্তের লোহিত কণিকার জীবন ১২০ দিন বা ৪ মাস আর অনুচক্রিকার (Platelets) জীবন ৭-১০ দিন। আপনি রক্তদান না করলেও নির্দিষ্ট সময় পরে কোষগুলো মারা যায় এবং নতুন কোষ জন্ম নেয়।

কত দিন দানকৃত রক্ত ব্যবহার করা যায়

- রক্ত সংগ্রহের পর রক্তের তিনটি উপাদান পৃথক করা হয়।
- লোহিত কণিকা (RBC/Packed cell) ১৮০-২২০ মিলি ২-৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রায় ৩৫ দিন সংরক্ষণ করা যায়।
- রক্তরস (Plasma/FFP) ১৫০-২০০ মিলি-২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রায় ১ বছর সংরক্ষণ করা যায়।
- অণুচক্রিকা (Platelet) ৫০-৬০ মিলি স্বাভাবিক ঘরের তাপমাত্রায় (২২-২৪ ডিগ্রি সে.) ৫ দিন সংরক্ষণ করা যায়।

প্লেটেলেট ফেরেসিস (Plateletpheresis) অনুচক্রিকা (Platelet) কী জন্য প্রয়োজন

অণুচক্রিকা (Platelet) রক্তের তিনটি প্রধান উপাদানের একটি। সাধারণত রক্তের ক্যান্সার (Leukemia) কেমোথেরাপি পাওয়া রোগী, অঙ্গ প্রতিস্থাপিত রোগী (e.g. Bone Marrow Transplant, Organ Transplant) ডেঙ্গু জ্বরের রোগী এবং জীবন বিনাশকারী রক্তক্ষরণ এই সকল ক্ষেত্রে রোগীকে অনুচক্রিকা (Platelet) দেয়া হয়।

প্লেটেলেট ফেরেসিস (Plateletpheresis) আসলে কী?

প্লেটেলেট ফেরেসিস এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি যাতে একজন রক্তদাতার শরীর থেকে একটি যন্ত্রের (Apheresis Machine) মাধ্যমে রক্তদাতার শুধু অনুচক্রিকা (Platelet) সংগ্রহ করা হয়। রক্তদাতার রক্ত সরাসরি এই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ভেতরে প্রবাহিত করা হয়, নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুচক্রিকা (Platelet) নির্দিষ্ট সময় পর একটি ব্যাগে জমা হয় এবং রক্তদাতার সম্পূর্ণ রক্ত আবার তার শরীরে ফিরে যায়। এই পদ্ধতিতে সংগ্রহিত অনুচক্রিকা (Platelet) কে SDP (Single Donor Platelet) বলে।

প্রতি ২ সেকেন্ড কারো না কারো রক্তের প্রয়োজন

মূলকথা

- প্লেটেলেটফেরেসিস (Plateletpheresis) এবং রক্তদানের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই।
- একজন রক্তদাতা থেকে সংগৃহীত অনুচক্রিকা (Platelet)- এর গুণগত মান খুব ভালো।
- প্লেটেলেটফেরেসিস (Plateletpheresis) পদ্ধতিতে একজন রক্তদাতা থেকে সংগৃহীত অনুচক্রিকা (Platelet) ৫-৬ ব্যাগ রক্ত থেকে সংগ্রহিত অনুচক্রিকার (Platelet) সমান।
- প্লেটেলেটফেরেসিস (Plateletpheresis) পদ্ধতিতে একজন রক্তদাতা সপ্তাহে ২ বার এবং বছরে সর্বোচ্চ ২৪ বার অনুচক্রিকার (Platelet) দান করতে পারে।
- প্লেটেলেটফেরেসিস (Plateletpheresis) পদ্ধতি সাধারণত ৯০-১২০মিনিটে সম্পন্ন হয়।
- একজন রক্তদাতা (SDP) থেকে সংগৃহীত অনুচক্রিকা (Platelet) একজন ৭০ কেজি ওজনের প্রাপ্ত বয়স্ক রোগীর শরীরে সঞ্চালন করলে সাধারণত অনুচক্রিকার (Platelet) বৃদ্ধি পায় ৩০,০০০-৪০,০০০/- মাইক্রোলিটার।

ল্যাবএইড ব্লাড ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয় নিবন্ধিত একটি আন্তর্জাতিক মানের সয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এখানে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রেখে ব্লাড ব্যাংক সংক্রান্ত যাবতীয় সেবা দেয়া হয়। যেমন– উন্নতমানের রক্তদান কেন্দ্র, রক্তের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উন্নতমানের Laboratory সেবা, রক্তের বিভিন্ন উপাদান পৃথকীকরণের ব্যবস্থা, রক্ত সংরক্ষণের জন্য উন্নতমানের HELMER ২ - ৮° সে. Refrigerator, HELMER- ৪০° সে. Freezer এবং Platelet Shaker আছে। এখানে উন্নতমানের MCS+ Apheresis মেশিন আছে যা থেকে প্লেটেলেটফেরেসিসের সাহায্যে অনুচক্রিকা সংগ্রহ করা হয়। এখানে সর্বক্ষণ রক্তের উপাদান সমূহের বৈশিষ্ট্যগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

"মনে রাখবেন আজকের যিনি রক্তদাতা হয়তো বা তিনিই আগামী দিনের রক্ত গ্রহীতা"

লিউকেমিয়া
রক্তের ক্যান্সার

ডা. মো. সাহাদত হোসেন
এমবিবিএস (ঢাকা), বিসিএস (স্বাস্থ্য), এফসিপিএস (মেডিসিন)
অ্যাডভান্স ট্রেনিং অন রিউমাটোলজি এন্ড এন্ডোক্রাইনোলজি
মেডিসিন, বক্ষব্যাধি, বাত-ব্যথা, ডায়াবেটিস ও থাইরয়েড বিশেষজ্ঞ
এক্স রেজিষ্ট্রার– শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরিশাল
চেম্বার: ল্যাবএইড লিঃ (ডায়াগনস্টিক), বরিশাল।

লিউকেমিয়া রক্ত বা অস্থিমজ্জার ক্যান্সার। শরীরের রক্ত গঠনকারী কলা, অস্থিমজ্জা এবং লসিকানালির ক্যান্সারকে লিউকেমিয়া বলে। সাধারণত শ্বেত রক্তকণিকার অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি থেকেই এ রোগের নামকরণ। নিউক-অর্থ সাদা, হিমো-অর্থ রক্ত। রক্তে ভ্রাম্যমান এই শ্বেত রক্তকণিকাগুলি অপরিণত ও অকর্মণ্য। রক্ত উৎপাদনকারী অস্থিমজ্জার মধ্যে এদের সংখ্যাধিক্যের ফলে নানাভাবে স্বাভাবিক রক্তকণিকার উৎপাদন ব্যাহত হয়। তবে সব লিউকেমিয়াতেই যে শ্বেতকণিকার সংখ্যাধিক্য দেখা যাবে, তা নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ্যালিউকেমিয়া অর্থাৎ শ্বেতকণিকার স্বল্পতা বা সাব-লিউকেমিয়া অর্থাৎ প্রায় স্বাভাবিক সংখ্যার শ্বেতকণিকাও দেখা যেতে পারে। তাই ঠিক সংখ্যা দিয়ে নয়, রক্তকণিকার অস্বাভাবিকতার ফলেই এ রোগ হয়।

রোগের কারণ

লিউকেমিয়ার অধিকাংশ কারণই অজানা। তবে নিম্নলিখিত কারণগুলো দায়ী করা হয়।

ক) **তেজস্ক্রিয়তা:** রেডিয়েশন, রঞ্জনরশ্মি, কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ও ডায়াগনস্টিক থেকে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণ।

খ) **সাইটোটক্সিক ড্রাগ:** ক্যান্সারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ওষুধের কারনেও এ রোগ হতে পারে।

গ) **বিভিন্ন রকম কেমিকেল:** যেমন-বেনজিন, চুলের ডাই রং এর ব্যবহার এ রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

ঘ) **কিছু কিছু ভাইরাসকে এই রোগের জন্য দায়ী করা হয়:** যেমন-হিউম্যান টি লিম্ফোট্রপিক ভাইরাস।

ঙ) পারিবারিক ইতিহাস থেকে জানা যায় কিছু ব্যক্তির লিউকেমিয়া বংশগত যাদের ক্রমোযোমে অস্বাভাবিকতা রয়েছে, তাদের লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হবার ঝুঁকি খুব বেশি। গর্ভাবস্থায় মায়ের লিউকেমিয়া থাকলে শিশুরও হতে পারে।

প্রকার ভেদ

লিউকেমিয়ার অনেকগুলো প্রকারভেদ রয়েছে। লিউকেমিয়া কত দ্রুত বৃদ্ধি পায় তার ওপর নির্ভর করে লিউকেমিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

ক) তীব্র লিউকেমিয়া বা অ্যাকিউই লিউকেমিয়া।

খ) দীর্ঘস্থায়ী লিউকেমিয়া বা ক্রনিক লিউকেমিয়া।

এর পাশাপাশি কোন ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা আক্রান্ত হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে লিউকেমিয়াকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়া: এখানে মজ্জাকোষের একটি প্রকরণের ম্যালিগন্যাট পরিবর্তন হয় যা লসিকা উৎপন্ন করে।

মায়ালোজেনাস লিউকেমিয়া: এখানে মজ্জাকোষের একটি প্রকরণের ম্যালিগন্যাট পরিবর্তন হয়, যা লোহিত রক্তকণিকা শ্বেত রক্তকাণিকা এবং অনুচক্রিকা উৎপন্ন করে।

এই দুইটি শ্রেণি বিভাগকে মিলিয়ে সর্বমোট চারটি প্রধানভাগে লিউকেমিয়াকে ভাগ করা যায়। যাদের আবার উপভাগ রয়েছে। এ শ্রেণি বিভাগের বাইরেও কিছু দুর্লভ লিউকেমিয়া রয়েছে।

অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া (AII): এটি শিশুদের সবচেয়ে বেশি হয়। তবে প্রাপ্তবয়স্কদেরও হয়, বিশেষ করে ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব। এদের কেমোথেরাপি ও রেডিওথেরাপি দেয়া হয়। বয়স ভেদে বেঁচে থাকার হারের তারতম্য ঘটে ৮৫% শিশু ও ৫০% প্রাপ্ত বয়স্ক।

ক্রনিক লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়া (CII): এটি ৫৫ বছরের ওপরের মানুষের বেশি হয়। এটি কম বয়স্কদের হতে পারে কিন্তু শিশুদের প্রায় হয় না বললেই চলে। আক্রান্তের দুই-তৃতীয়াংশই পুরুষ।

অ্যাকিউট মায়েলয়েড লিউকেমিয়া (AML): প্রধানত প্রাপ্তবয়স্কদের হয়। খুব অল্পই শিশুদের হয়। আক্রান্তের অধিকাংশই নারী। এটি কেমোথেরাপি দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

ক্রনিক মায়েলয়েড লিউকেমিয়া (CML): প্রধানত প্রাপ্তবয়স্কদের হয়। খুব অল্পই শিশুদের হয়।

উপসর্গ

যেসব লক্ষণ ও উপসর্গ দেখা দেয়।

- কাঁপুনি দিয়ে জ্বর
- অবসাদগ্রস্ততা এবং দুর্বলতা
- বারবার সংক্রমণ
- ওজন হ্রাস পাওয়া
- লসিকানালি ফুলে যাওয়া, যকৃত ও প্লীহা ফুলে যাওয়া
- খুব সহজেই রক্তপাত হওয়া ও কালশিরা পড়া
- ত্বকে ছোট ছোট লাল দাগ পড়া
- রাতের বেলা খুব ঘাম হওয়া
- হাড়ে ও অস্থিসন্ধিতে তীব্র ব্যথা।

উপরোক্ত লক্ষণ ও উপসর্গগুলো দেখা দেয়ার সাথে সাথে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা

পরিপূর্ণ রক্ত পরীক্ষা এবং অস্থিমজ্জা পরীক্ষার মাধ্যমে লিউকেমিয়া শনাক্ত করা যায়।

ক) রক্ত পরীক্ষা

১. রক্তশূন্যতা অর্থাৎ হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যাওয়া।
২. শ্বেতকণিকার পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে বা কমে যেতে পারে।
৩. অনুচক্রিকার পরিমাণ কমে যাবে।
৪. ব্লাড ফিল্ম: এক্ষেত্রে পরিপক্ক শ্বেত কণিকার চেয়ে অপরিপক্ব শ্বেত কণিকার বা ব্লাস্ট কোষের পরিমাণ বেড়ে যায়।

খ) অস্থিমজ্জা পরীক্ষা

১. কোষের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি।
২. সাধারণ পরিপক্ক কোষের চেয়ে অপরিপক্ব ব্লাস্ট সেলের আধিক্য।

ক্রনিক লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়া

সাধারণত যেসব কারণে চিকিৎসা দেয়া হয়–

১. হিমোগ্লোবিন বা অনুচক্রিকার সংখ্যা কমে যাওয়া।
২. রোগ আরও বৃদ্ধি পাওয়া
৩. রোগের কারণে প্লীহা বা লসিকা গ্রন্থির আকার বেড়ে যাওয়া
৪. লসিকা কোষ বা লিম্ফোসাইটের অত্যধিক বৃদ্ধি।

অ্যাকিউট মায়েলোজেনাস লিউকেমিয়া (AML): বিভিন্ন অ্যান্টি ক্যান্সার ওষুধ AML-এর চিকিৎসার জন্য কার্যকর। AML এর ধরন এবং রোগীর বয়সের তারতম্যের ওপর চিকিৎসা নির্ভর করে। এর উদ্দেশ্য হলো অস্থিমজ্জা ও দেহের সামগ্রিক রোগ নিয়ন্ত্রণ করা এবং সেইসাথে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের চিকিৎসা করা।

ক্রনিক মায়েলোজেনাস লিউকেমিয়া (CML): এ রোগের বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে। সঠিক সময়ে এ রোগ ধরতে পারলে উপযুক্ত চিকিৎসা দেয়া সম্ভব। যার ফলে অনেক রোগীই ভালো হয়ে যায়।

কেমোথেরাপি: এ ক্ষেত্রে যে সকল প্রয়োজনীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয় যা ক্যান্সার কোষগুলোকে জন্ম দিতে বাধা প্রদান করে। এটি (CML) এর ক্ষেত্রে প্রথম সারির ওষুধ।

হাইড্রেক্সি কার্বামাইড: পূর্বে বেশি ব্যবহৃত হলেও এখনও জনপ্রিয়।

আলফা ইন্টারফেরন: ইমাটিনিবের পূর্বে এটি প্রথম সারির ওষুধ ছিল। এ ওষুধ প্রায় ৭০% রোগ মুক্ত করতে সক্ষম।

অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন

অল্প বয়সের রোগীর ক্ষেত্রে কেমোথেরাপী দেয়ার পর এই চিকিৎসা দেয়া হয়। তবে যার অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন করা হবে তার ব্লাড গ্রুপিং এবং এইচএলএ টাইচ ম্যাচ করিয়ে এই চিকিৎসা করা হয়। অন্য কোনো জটিলতা না হলে এতে রোগী ভালো হয়ে যায়।

এই চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল তবে আশার বাণী হলো এই যে, বাংলাদেশে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্বল্প পরিসরে এখন অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে দেশে বসেই স্বল্প খরচে হয়তো এই সুবিধা লিউকেমিয়া রোগীরা গ্রহণ করতে পারবেন।

জেইমসেল প্রতিস্থাপন

লিউকেমিয়া তথ্য অন্যান্য ক্যান্সার চিকিৎসায় সামনের দিনগুলোতে আশার আলো নিয়ে আসবে এ পদ্ধতি, যা ক্যান্সার চিকিৎসায় বিপ্লব ঘটাবে। বিশেষ করে অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের জন্য উন্নত ও আধুনিক হাসপাতালে যেতে হয়। সঠিক সময়ে এই রোগ ধরতে পারলে এবং দ্রুত চিকিৎসা শুরু করতে পারলে অধিকাংশ রোগই ভালো হয়ে যায়।

রোগ নির্ণয়ের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে

ল্যাবএইড এখন বরিশালে

ডায়াগনস্টিক সেবাসমূহ:

- প্যাথলজি
- ডিজিটাল এক্স-রে
- সিটি-স্ক্যান
- এমআরআই
- 4D আলট্রাসনোগ্রাম
- ইসিজি
- ইকো-কার্ডিওগ্রাম
- কালার ডপলার
- ইটিটি
- ওপিজি
- ভিডিও এন্ডোসকপি
- ভিডিও কলোনসকপি
- ভিডিও ব্রনক্সকপি
- ভিডিও Laryngoscopy
- Pap's Smear
- সকল প্রকার হরমোন টেস্ট
- Torch প্যানেল
- হিস্টো ও সাইটোপ্যাথলজি
- বায়োকেমিস্ট্রি
- ইমিউনোলজি
- সেরোলজি
- হেমাটোলজি

কনসালটেশন সেবাসমূহ:

- মেডিসিন
- হৃদরোগ
- ফিজিক্যাল মেডিসিন
- গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি
- অ্যাজমা
- নিউরো মেডিসিন
- নিউরো সার্জারি
- নাক, কান ও গলা রোগ
- নবজাতক ও শিশু রোগ
- বাত, ব্যথা ও প্যারালাইসিস
- ডায়াবেটিস ও হরমোন রোগ
- গাইনি এন্ড অবস্
- লিভার রোগ
- কিডনি রোগ
- অর্থোপেডিক
- মেডিসিন ও বক্ষব্যাধি
- চর্ম ও যৌন রোগ
- চক্ষু রোগ
- ক্যান্সার
- ইউরোলজি
- জেনারেল সার্জারি
- স্পাইন সার্জারি

LAB AID LTD

ডায়াগনস্টিক > কনসালটেশন > মেডিকেল চেক-আপ > কর্পোরেট মেডিকেল চেক-আপ > ডায়াবেটিক চেক-আপ
ফার্মেসি > অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস > ল্যাবএইড হাসপাতাল তথ্য কেন্দ্র

ল্যাবএইড লিমিটেড (ডায়াগনস্টিক), বরিশাল

বাড়ি ১০৬, সদর রোড, বরিশাল, ফোন : (০৪৩১) ২১৭৭৭১০, ২১৭৭৭১১, ২১৭৭৭১২
ই-মেইল : info@labaidgroup.com, ওয়েব : www.labaidgroup.com

অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া

ডা. মাহফুজা শীরিন
এমবিবিএস, এফসিপিএস (শিশু)
নবজাতক ও শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশ শিশু স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট
ঢাকা শিশু হাসপাতাল, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
চেম্বার : ল্যাবএইড লিঃ (ডায়াগনস্টিক), মিরপুর।

বয়স ও লিঙ্গ অনুযায়ী রক্তে প্রয়োজনীয় পরিমাণ হিমোগ্লোবিনের চেয়ে কম হিমোগ্লোবিন থাকার অবস্থাকে রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়া বলে। নানাবিধ কারণে রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়া হতে পারে। এর মধ্যে আছে অপুষ্টি ও অজ্ঞতা, গর্ভধারণ, ঋতুস্রাব, শিশুদের কৃমি সংক্রমণ,পাকস্থলীর আলসার থেকে শুরু করে রক্তের ক্যান্সার পর্যন্ত। এছাড়া বিভিন্ন রোগে রক্তশূন্যতা হতে পারে। এর মধ্যে আছে, আয়রনের অভাবজনিত রক্তশূন্যতা, হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া বা থ্যালাসেমিয়া, লিউকোমিয়া, অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া।

আমাদের দেহে রক্ত তৈরি হয় অস্থিমজ্জায়। হাড়ের মধ্যভাগে থাকে অস্থিমজ্জা। এই অস্থিমজ্জা রোগাক্রান্ত কিংবা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ফলে যখন রক্তের সকল প্রকার রক্তকণিকা স্বাভাবিক পরিমাণ তৈরি করতে পারে না, তখন শরীরে দেখা দেয় অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া একটি বিরল ও গুরুতর অসুখ। যেকোন বয়সেই অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হতে পারে। তবে কিশোর-যুবক এবং বৃদ্ধ এ দুই বয়সে এ রোগ বেশি হতে দেখা যায়। বাংলাদেশে সঠিক কোন পরিসংখ্যান না থাকলেও এই অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার অনেক রোগী আছে।

অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার বিভিন্ন কারণ আছে। তার মধ্যে আছে আণবিক বিকিরণ, ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত রেডিয়েশন ও কেমোথেরাপি। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসলে যেমন– ডিডিটি, বেনজিন, টিএনটি। বিভিন্ন ওষুধের মধ্যে আছে ক্লোরাম ফেনিকল, ক্লোরপ্লামাজিন, টলবুটামাইড, ইন্ডোমেথাসিন, কার্বামাজেপিন, হাইড্রালাজিন। বিভিন্ন সংক্রমণ যেমন ভাইরাল হেপাটাইটিস, পারভোভাইরাস বি-১৯, এপসটেন বার ভাইরাস, সাইটোমেগালো ভাইরাস, এইচআইভি। কিছু অটোইমিউন রোগ, কিছু জন্মগত রোগ যেমন ফ্যানকোনি অ্যানিমিয়া, ডায়মন্ড ব্যালফ্যান অ্যানিমিয়া ইত্যাদি কারণে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হতে পারে। কখনও কখনও গর্ভাবস্থায় অটোইমিউন রোগের কারণে নারীদের অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হয়ে থাকে, যদিও তা খুবই বিরল। প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষেত্রে এ রোগের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।
এ রোগের লক্ষণ হঠাৎ করেই প্রকাশ পেতে পারে, আবার কখনও কখনও

খুব ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। অস্থিমজ্জা থেকে তিন ধরনের রক্তকণিকা তৈরি হয়। এসব রক্তকণিকার মধ্যে আছে লোহিত রক্তকাণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অনুচক্রিকা। প্রতিটি রক্তকণিকা বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে থাকে। যেহেতু অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়াতে রক্ত কাণিকাগুলো অনেক কমে যায়, সুতরাং এসব রক্তকণিকা যেসব কাজ করে সেসব কাজ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে শরীরে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে।

অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া রোগের লক্ষণসমূহ

১। দুর্বল লাগা, ২। অবসাদ, মাথা ঘোরা, মাথাব্যথা হওয়া
৩। অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে যাওয়া, ৪। হৃদ স্পন্দন দ্রুত ও অনিয়মিত হওয়া, ৫। দেহের ত্বক ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করে, ৬। জ্বর, ৭। মুখে প্রদাহ, ৮। শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্তপাত হওয়া যেমন দাঁতের মাড়ি, নাক, কাশি বা বমির সাথে, প্রসাবের সঙ্গে, মলদ্বার দিয়ে রক্তপাত হয়।
৯। অনেক সময় চামড়ার নিচে রক্তক্ষরণ হয় যা মশার কামড়ের দাগের মতো দেখা যায়, ১০। যেকোন কারণে কেটে গেলে কাটা স্থান থেকে দীর্ঘসময় ধরে রক্তক্ষরণ হওয়া।

রোগ নির্ণয়

অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার ডায়াগনসিস করা যায় সহজেই। রোগের লক্ষণ দেখেই রোগটি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়া রোগীর কাছ থেকে ভালোভাবে ইতিহাস নিতে হবে। তবে নিশ্চিত হবার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা জরুরি। অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ায় রক্ত পরীক্ষা করলে দেখা যাবে হিমোগ্লোবিন এবং সব ধরনের রক্তকণিকা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কমে গেছে, যাকে প্যানসাইটোপেনিয়া বলে। আর শতভাগ নিশ্চিত হবার জন্য অস্থিমজ্জা পরীক্ষা করা হয়। অস্থিমজ্জা পরীক্ষা করে নিশ্চিতভাবে রোগটি নির্ণয় করা যায়। তাছাড়া কারণ নির্ণয়ের জন্য কিছু পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। যেমন- লিভার ফাংশন টেস্ট, ভাইরাস শনাক্তকরণের পরীক্ষা, বিভিন্ন ধরনের এক্স রে, সিটি স্ক্যান ইত্যাদি।

চিকিৎসা

অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের রক্ত পরিসঞ্চালন করে চিকিৎসা করা হয়, ফলে রোগীর রক্তশূন্যতা কমে এবং রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়। রক্ত পরিসঞ্চালন হতে পারে সম্পূর্ণ রক্ত, লোহিত রক্তকাণিকা অথবা অনুচক্রিকা আলাদা আলাদাভাবে। ইনফেকশনের জন্য এন্টিবায়োটিক দেয়া হয়। কিন্তু এসব চিকিৎসা শুধু রোগীর অবস্থার সাময়িক উন্নতি সাধন করে।

এ রোগ নিরাময় করতে হলে প্রয়োজন অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন বা বোনম্যারো ট্রান্সপ্লানটেশন। ৩০ বছরের নিচে আক্রান্ত রোগীর জন্য এটাই প্রধান চিকিৎসা, সে ক্ষেত্রে এইচএলএ মেলানো ভাই-বোনদের কাছ থেকে এই অস্থিমজ্জা নিতে হবে। যাদের বয়স বেশি অথবা সুবিধাজনক ডোনার নেই তাদেরকে সাইক্লোস্পোরিন ও এন্টিথাইমোসাইট গ্লোবিউলিন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু এসব চিকিৎসা প্রতিকারের চেয়ে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া প্রতিরোধের দিকে নজর দিতে হবে। রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করার ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। ইচ্ছেমতো এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যাবে না। যেসব ওষুধ অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া করতে পারে সেসব ওষুধ খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করা উচিত নয়। এক্সরে বা বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া ঘটাতে পারে। এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বিয়ের আগে
কেন রক্ত পরীক্ষা!

ডা. এ. কে এম. কামরুজ্জামান
এমবিবিএস, এফসিপিএস (হেমাটোলজি)
ব্লাড ক্যান্সার ও রক্ত রোগ বিশেষজ্ঞ
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান (হেমাটোলজি)
রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
চেম্বার: ল্যাবএইড লিঃ (ডায়াগনস্টিক), রংপুর।

অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা এড়াতে দুই পরিবারের সম্মতিতেই বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করা জরুরি। অনাগত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে রক্ত পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো। বিয়ের আগেই কেন রক্ত পরীক্ষা! যেনে নিন আদ্যোপান্ত।

পাত্র-পাত্রী থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত থাকলে তাদের সন্তানও এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। রক্ত পরীক্ষা করিয়ে দেখে নিন ছেলে বা মেয়ে থ্যালাসেমিয়ার বাহক কি না। থ্যালাসেমিয়া একটি বংশগত রোগ। হেপাটাইটিস-বি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। পাত্র বা পাত্রী যেকোনো একজনের দেহে এর ভাইরাস থাকলে অন্যজনে আক্রান্ত হবার শঙ্কা থাকে। সেই সঙ্গে অনাগত সন্তানের মধ্যেও রোগটি সংক্রমিত হতে পারে। এটি অন্যতম এক ঘাতক ব্যাধি। তাই বিয়ের আগেই রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত হওয়া উচিত পাত্র কিংবা পাত্রীর হেপাটাইটিস-বি আছে কি না।
রক্তের পরীক্ষা করলেই জানা যাবে পাত্র-পাত্রী কেউ সিফিলিসের জীবাণু বহন করছে কি না। ভিডিআরএল পরীক্ষায় যৌন রোগ আছে কি না, দেখা যাবে। সিফিলিসে আক্রান্ত বাবা-মায়ের সন্তান বিকলাঙ্গও হতে পারে। এছাড়া রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেই ধরা পড়বে এইডসের জীবাণু।

রক্তের গ্রুপ

প্রথমেই রক্তের গ্রুপগুলো সম্পর্কে জেনে নিন। প্রধানত রক্তের গ্রুপের দুইটি ভাগ। একটা হল এবিও পদ্ধতি অর্থাৎ (এ, বি, এবি এবং ও) অন্যটা আরএইচ ফ্যাক্টর (আরএইচ পজেটিভ এবং আরএইচ নেগেটিভ)। এই রেসাস ফ্যাক্টরই ঠিক করে দেয় ব্লাডগ্রুপ পজেটিভ হবে, না নেগেটিভ হবে। ব্লাড গ্রুপগুলো হল: এ পজেটিভ, এ নেগেটিভ, বি পজেটিভ, বি নেগেটিভ, এবি পজেটিভ, এবি নেগেটিভ, ও পজেটিভ এবং ও নেগেটিভ।

রক্ত গ্রহণে সচেতনতা

যখন কোনো নেগেটিভ গ্রুপের ব্যক্তিকে পজেটিভ গ্রুপের রক্ত দেওয়া হয় তখন প্রথমবার সাধারণত কিছু হয় না। তবে এর বিরুদ্ধে রোগীর শরীরে একটি এন্টিবডি তৈরি হবে। যার ফলে এই রোগী আবার কখনো যদি পজেটিভ গ্রুপের রক্ত নেয়, তবে তার রক্তের কোষগুলো ভাঙতে শুরু করবে। এ কারণে কাঁপুনি, জ্বর কিংবা কিডনি অকেজো থেকে শুরু করে মারাত্মক সব শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। এই সমস্যাকে চিকিৎসাবিদ্যায় বলা হয় এবিও ইনকমপ্যাটিবিলিটি।

স্বামী-স্ত্রীর রক্তের পের কেমন হলে ভালো?

স্বামীর রক্তের গ্রুপ যদি পজেটিভ হয় তাহলে স্ত্রীর পজেটিভ হতে হবে। আর যদি স্বামীর রক্তের গ্রুপ নেগেটিভ হয়, তাহলে স্ত্রীর পজেটিভ বা নেগেটিভ যেকোনো একটি হলেই হবে। তবে স্বামীর

গ্রুপ যদি পজেটিভ হয় তাহলে কোনোভাবেই স্ত্রীর রক্তের নেগেটিভ হওয়া চলবে না। এক্ষেত্রে স্ত্রীর গ্রুপ যদি নেগেটিভ হয় তাহলে তার স্বামীর রক্তের গ্রুপ নেগেটিভ হলে অনেক সমস্যা এড়ানো যাবে।

স্বামীর রক্তের গ্রুপ	স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ	সন্তানের অবস্থা
পজিটিভ (+)	পজেটিভ (+)	সুস্থ সন্তান
নেগেটিভ (-)	নেগেটিভ (-)	সুস্থ সন্তান
নেগেটিভ (-)	পজেটিভ (+)	সুস্থ সন্তান
পজিটিভ (+)	নেগেটিভ (-)	প্রথম সন্তান সুস্থ, দ্বিতীয় থেকে সমস্যা

স্বামীর রক্তের গ্রুপ পজেটিভ এবং স্ত্রীর নেগেটিভ হলে কী হতে পারে?

স্বামী-স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ মিলে গেলে কোনো সমস্যা হয় না। তবে স্ত্রী যদি নেগেটিভ হয় আর স্বামী যদি পজেটিভ হয় তাহলে 'লিথাল জিন' বা 'মারন জিন' নামে একটি জিন তৈরি হয় যা পরবর্তীতে জাইগোট তৈরিতে বাধা দেয় বা জাইগোটকে মেরে ফেলে। সে ক্ষেত্রে মৃত বাচ্চার জন্ম হতে পারে। বাচ্চা হতে পারে বর্ণান্ধ। এছাড়া যখন কোনো নেগেটিভ গ্রুপের মা পজেটিভ ফিটাস (ভ্রূণ) ধারণ করে তখন সাধারণত প্রথম বাচ্চার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু ডেলিভারির সময় পজেটিভ ভ্রূণের রক্ত, সেন্টার (গর্ভফুল)'র বাধা ভেদ করে মায়ের শরীরে প্রবেশ করবে। মায়ের শরীরেও প্রসবের সময় যে রক্ত প্রবেশ করবে, তা প্রসবের কয়েক মাসের মধ্যেই মায়ের শরীরে আরএইচ এন্টিবডি তৈরি করবে। যখন মা দ্বিতীয় সন্তান বহন করবেন, তখন যদি তার ভ্রূণের ব্লাডগ্রুপ পুনরায় পজেটিভ হয়, তাহলে মায়ের শরীরে আগে যে এন্টিবডি তৈরি হয়েছিলো সেটা প্লাসেন্টার বাধা ভেদ করে বাচ্চার শরীরে প্রবেশ করবে। আর যখন এটি ভ্রূণের শরীরে ঢুকবে তখন ভ্রূণের লোহিত রক্তকণিকার সেল ভেঙে যাবে। এই সমস্যাকে চিকিৎসা বিদ্যায় বলা হয় আরএইচ ইনকমপ্যাটিবিলিটি।

আশার কথা

আগে কখনো অ্যাবরশন না হয়ে থাকলে অনেক সমস্যা এড়ানো যাবে। শুধু সচেতন থাকতে হবে। স্বামীর ব্লাডগ্রুপ পজেটিভ হলে, বাচ্চা জন্মের পরপরই বাচ্চার ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করতে হবে। যদি নেগেটিভ হয় মায়ের মতো, তবে কিছু করার দরকার হয় না। আর পজিটিভ হলে এন্টি ডি ইনজেকশন নিতে হবে ডেলিভারির ৭২ ঘন্টার মধ্যে। আরো বিস্তারিত জানতে এবং বাচ্চা ধারণের আগেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। সুখে থাকুন।

হেপাটাইটিস-বি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। পাত্র বা পাত্রী যে কোনো একজনের দেহে এর ভাইরাস থাকলে অন্যজনে আক্রান্ত হবার শঙ্কা থাকে। সেই সঙ্গে অনাগত সন্তানের মধ্যেও রোগটি সংক্রমিত হতে পারে। এটি অন্যতম এক ঘাতক ব্যাধি। তাই বিয়ের আগেই রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত হওয়া উচিত পাত্র কিংবা পাত্রীর হেপাটাইটিস-বি আছে কি না। রক্তের পরীক্ষা করলেই জানা যাবে পাত্র-পাত্রী কেউ সিফিলিসের জীবাণু বহন করছে কি না। ভিডিআরএল পরীক্ষায় যৌন রোগ আছে কি না, জানা যায়।

সুস্থ্য থাকুন সহজে

ডা. সিদ্ধার্থ মজুমদার
মেডিকেল সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট
ল্যাবএইড ফার্মাসিটিউক্যালস লিমিটেড

মশা মারতে যেমন কামান দাগানোর দরকার হয় না, তেমনি সুস্থ থাকতে দৈনন্দিন জীবনে খুব বেশি পরিবর্তনেরও কিন্তু দরকার নেই। যেটা দরকার সেটা হলো সচেতনতা। সচেতন হতে হবে খাওয়া-দাওয়ায়, আর খানিকটা চালচলনে। বড় ধরনের পরিবর্তন না এনেই কেমন করে সুস্থ থাকা যায়; আসুন, জেনে নেওয়া যাক।

সকাল, দুপুর আর রাতের খাবারটা খেতে হবে ঠিক সময়ে। সকাল, দুপুর কিংবা রাত যে সময়েই খাবারই খান না কেন, ঘরে তৈরি খাবারেই উদরপূর্তি সারা ভালো। কেমন হবে সারা দিনের খাবার, সেটা জেনে নেই আগে।

সকালের খাবারে ভাত, রুটি, ডিম রাখতে পারেন। যদি পরোটা খেতে ইচ্ছে হয়, অবশ্যই খেতে পারবেন, তবে সেই পরোটা ঘরেই বানিয়ে নিন। দোকানের পরোটা কিংবা সবজিতে থাকে ডালডা কিংবা বহুবার ব্যবহৃত তেল। নিয়মিত এগুলো খেলে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। এ ছাড়া উচ্চ রক্তচাপ এবং ওজন বাড়ার শঙ্কাতো থাকছেই।

মধ্য সকালে শিঙাড়া, সমুচা, রোল কিংবা স্যান্ডউইচ খান অনেকে। এগুলো বাদ দিতে হবে। ক্ষুধা লাগলে খান ননিবিহীন দুধ, সঙ্গে খেতে পারেন কয়েক টুকরো পাউরুটি। কিংবা বিস্কুট খেতে পারেন প্রয়োজনে। এ ছাড়া গলা ভেজাতে খেতে পারেন ফলের রস। চাইলে টকজাতীয় ফলও খেতে পারেন ইচ্ছেমতো। ওজন বাড়ার ভয় থাকবে না।

কর্মজীবীরা অনেকে দুপুরে প্যাকেটজাত খাবারেই অভ্যস্ত থাকেন। পোলাও, তেহারি, বিরিয়ানির প্যাকেটগুলোই দুপুরের খাবারের জন্য জনপ্রিয়। কিন্তু এই খাবারগুলোতে থাকে প্রচুর পরিমাণে অসম্পৃক্ত চর্বি, যেটি উচ্চ রক্তচাপের জন্য দায়ী। হৃদরোগও ডেকে আনে এই খাবারগুলো। দুপুরে এসব খাবার থেকে দূরে থেকে সহজ-সরল মাছ, মাংস, সবজি কিংবা ডালের দিকেই নজরটা রাখুন।

রাতের খাবার দেরি করে না খেয়ে, আগেই খাওয়ার চেষ্টা করুন। মাছ, মাংস, ডিম, সবজি সবই খেতে পারবেন। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবেন না। খাওয়ার পর প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে নিন। খেয়েই ঘুমাতে গেলে ঠিকমতো হজম হবে না। অ্যাসিডিটি হওয়ার প্রবণতা বাড়বে।

সন্ধ্যা রাতে খেলে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আবার ক্ষুধা লাগতে পারে। সে ক্ষেত্রে দুধ, দই, খইয়ের মতো সহজপাচ্য খাবারগুলো খেতে পারেন। পোলাও, বিরিয়ানির মতো মজাদার খাবারগুলো তো জীবন থেকে ছেঁটে ফেলা যাবে না। তাই যেদিন অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার খাবেন, সেদিন শারীরিক পরিশ্রমের মাত্রাটাও খানিকটা বাড়িয়ে দিন।

শারীরিক নানা ধরনের ব্যায়াম করে শরীরকে বশে রাখা যায়। কিন্তু এই লেখাতে প্রথম থেকেই বলে আসছি, দৈনন্দিন জীবনযাপনে বড় ধরনের পরিবর্তন না এনে কেমন করে শরীর ঠিক রাখা যায়। তাই কষ্টের ব্যায়াম না করে সহজ উপায় হলো হাঁটা। টানা ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট হাঁটলে রক্তে চলমান চর্বি ফুরিয়ে আসে। তাই অফিস থেকে বাড়িতে ফেরার পথে খানিকটা পথ হেঁটেই ফিরুন। শারীরিক সক্ষমতা থাকলে অফিস কিংবা বাড়িতে লিফট ব্যবহার না করে, সিঁড়িতেই চড়ুন। হাড় ও হার্ট দুটোই ভালো থাকবে।

ল্যাবএইড গ্রুপ
বেস্ট পারফর্মার অব দ্যা ইয়ার-২০১৫

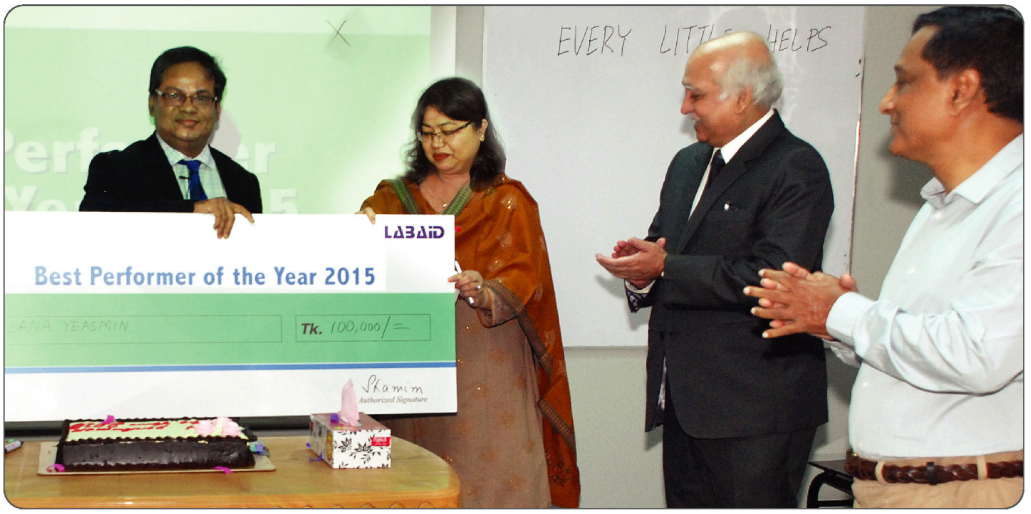

গত ৩১ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে ল্যাবএইড গ্রুপ তার প্রতিষ্ঠানের সকলকর্মীদের মাঝ থেকে সারা বছরের কাজের মূল্যায়ন করে, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে সবচেয়ে ভাল কাজের স্বীকৃতি হিসেবে 'বেস্ট পারফর্মার অব দ্যা ইয়ার-২০১৫' এর পুরষ্কার প্রদান করে। এ বছরে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সব চেয়ে ভাল কাজ করে পুরষ্কারটি অর্জন করেন ল্যাবএইড গ্রুপের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিভাগের এ জি এম আফসানা ইয়াসমিন। ল্যাবএইড গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. এ এম শামীম পুরষ্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে নগদ এক লক্ষ টাকা প্রদান করেন।

ল্যাবএইড গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ ধানমণ্ডি শাখায় প্রতিষ্ঠানটির কর্পোরেট সেমিনারে এই পুরষ্কারটি প্রদান করা হয়। এসময় ল্যাবএইড গ্রুপের সকল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

বেস্ট পারফর্মার ২০১৫

আফসানা ইয়াসমিন
সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিভাগ
ল্যাবএইড গ্রুপ

ল্যাবএইড
হোম সার্ভিস

বাংলাদেশের রোগ নির্ণয় সেবাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নেবার লক্ষ্যে রোগীদের সেবায় ল্যাবএইড-এ যুক্ত আছে **"ল্যাবএইড হোম সার্ভিস"** (রোগীর স্যাম্পল সংগ্রহ)। রোগীর ডায়াগনস্টিক / প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনে এই আয়োজন।

হোম সার্ভিস (স্যাম্পল সংগ্রহ)

আপনার অথবা রোগীর সুবিধার্থে, ডায়াগনস্টিক / প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার স্যাম্পল সংগ্রহের জন্য ল্যাবএইডের এই হোম সার্ভিস সুবিধা।

শুধুমাত্র একটি ফোন করেই আপনি পেতে পারেন আপনার অথবা রোগীর প্রয়োজনীয় ডায়াগনস্টিক / প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুবিধা। আপনার ফোন পেলে আমাদের দক্ষ এবং অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান পৌঁছে যাবে আপনার নির্দেশিত ঠিকানায়। সংগ্রহ করে আনবে আপনার অথবা রোগীর প্রয়োজনীয় স্যাম্পল।

পরামর্শ ও অভিযোগ: 017 6666 2669

• স্যাম্পল সংগ্রহের জন্য:
017 6666 1900, 017 6666 1452

LAB AID LTD

ল্যাবএইড লিমিটেড (ডায়াগনস্টিক)
বাড়ি ১, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা, ফোন : ৫৮৬১০৭৯৩-৮, ৯৬৭০২১০-৩
ই-মেইল : info@labaidgroup.com, ওয়েব : www.labaidgroup.com

Molecular Diagnostic & Cytogenetic Lab

Unmask the horizon of molecular diagnosis

Dealing with quality, a state of the art laboratory facility equipped with latest molecular diagnostic instrumentation and high quality IVD kits, to pinpoint diagnosis of infectious diseases, cancer and genetic diseases.

Our test facilities include

Molecular panel

- HBV DNA
- HCV RNA
- HCV Genotyping
- MTB DNA
- HPV DNA
- CMV DNA

Human chromosome Analysis

- Karyotyping

Cancer molecular test

- BCR-ABL

HLA typing panel

- HLA-A,B,DR
- HLA-B27

Pioneer in Molecular biology scetor in Bangladesh

• For Details : 017 6666 1777

LAB AID LTD

LABAID LIMITED (DIAGNOSTIC)

House 1, Road 4, Dhanmondi, Dhaka 1205, Bangladesh

Tel : 58610793-8, 9670210-3, E-mail: pcr.labaid@gmail.com